নতুন করে বাঁচা

অন্নদাশঙ্কর রায়

নতুন করে বাঁচা

এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

অন্নদাশঙ্কর রায়

ভ্রমণের বই

পথে প্রবাসে
ইউরোপের চিঠি

ভূমিকা

যুদ্ধ তখনো শেষ হয়নি, দুর্ভিক্ষে গ্রাম উজাড়, নেতারা বন্দী। সেই শ্বাসরোধকারী পরিবেশে আমরা জনকয়েক স্বপ্নদ্রষ্টা মিলে নবজীবনের নক্‌শা আঁকি। শ্রীমণীন্দ্রলাল বসুর সম্পাদনায় আমাদের "পরিকল্পনা" প্রকাশিত হয়। তার গোড়ায় থাকে আমার প্রবন্ধ "নতুন করে বাঁচা।" ওটি পড়ে আমার প্রকাশক-বন্ধু শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার বলেন আমি যদি ওটিকে বড় করে লিখে দিই তিনি আলাদা একখানি বই আকারে ছাপবেন। উৎসাহিত হয়ে আমি তার আয়োজন করি, কিন্তু যাদের জন্যে আমার মাথাব্যথা তারাই মাথা কাটাকাটি করে মরল। দেশ গেল ভেঙে। মন গেল ভেঙে। প্রবন্ধটি বড় করে লেখা হলো না। যত বার চেষ্টা করি মন বলে, থাক গে।

ওদিকে "পরিকল্পনা" আর পাওয়া যায় না বললে চলে। প্রবন্ধটি সাধারণের অগোচর। সেইজন্যে আরো কয়েকটি রচনার সঙ্গে জুড়ে পুনঃপ্রকাশ করছি। খুঁটিনাটি অনেক পরিবর্তন দরকার। কিন্তু তা হলে নতুন করে লিখতে হয়। মন তাতে বিমুখ।

৩০শে ডিসেম্বর ১৯৫২ — অন্নদাশঙ্কর রায়

সূচী

নতুন করে বাঁচা

মনে করো, এ বছর আমার ক্ষেতে চল্লিশ মণ ধান হয়েছে। আমি যদি এই বছরই সবটা খরচ করতে পারতুম তা হলে কথা ছিল না। কিন্তু এ বছর আমার অত দরকার নেই, দরকার হতে পারে আসছে বছর যদি অজন্মা হয়। আমি আমার উদ্বৃত্ত ধান গোলাঘরে তুলে রাখার আয়োজন করছি এমন সময় তোমরা পাঁচ জন পাড়াপড়শী এসে ধার চাইলে। বললে, আমাদের বড় অভাব। আমি জানি তোমরা আমার দরকারের সময় আমার ধান আমাকে ফেরৎ দেবে। গোলায় তুলে রাখাও যা তোমাদের ধার দেওয়াই তাই। আমি তোমাদের ধার দিয়ে গোলায় তুলে রাখার হাঙ্গাম থেকে বাঁচলুম। তোমরাও বাঁচলে অনশন থেকে।

এই যে পরস্পরকে বাঁচানো এর জন্যে আমার উচিত নয় আমার পাড়াপড়শীর কাছ থেকে সুদ নেওয়া। সুদই যদি নিলুম তবে আর প্রতিবেশিতা কিসের? সুদ আমি কোন যুক্তি অনুসারে চাইব? ধান তো আমার হাতে উদ্বৃত্ত ছিলই, আবার তো আমার দরকারের সময় পাবই। এমন নয় যে আমি তোমাদের ধার দিয়ে নিজেকে বঞ্চিত করছি বা

দরকারের সময় তোমাদের টিকিটি দেখতে পাচ্ছিনে, মুশকিলে পড়েছি। সুতরাং সুদ যদি দাবী করি তবে সেটা তোমাদের অভাবের সুযোগ নেওয়া। সেটা নীতির দিক থেকে নিন্দনীয়। ধর্মপ্রতিষ্ঠাতারা নিন্দা করে গেছেন। ইসলাম তো স্পষ্ট বলে দিয়েছে ওটা হারাম।

আসল দিয়েছি, আসল ফিরে পাব, এর বেশী দাবী করা অন্যায়। অথচ অতিরিক্ত না নিয়ে আমি ছাড়ব না। তোমাদের উপায় নেই, তাই তোমরা তা দিতে রাজী হলে। কিন্তু দেবে কোত্থেকে ? তোমাদের শ্রমের ফল থেকে কেটে। নিজেদের বঞ্চিত করে। তোমাদের বঞ্চিত শ্রম আমার সঞ্চিত শ্রমের সঙ্গে যোগ দিলে যা হয় তারই নাম সুদে আসলে শোধ। এটা প্রতিবেশীর দ্বারা প্রতিবেশীর শোষণ। ধর্মশাস্ত্রে এর সমর্থন নেই। অর্থশাস্ত্রে যদি এর সমর্থন থাকে তবে সেটা অনর্থশাস্ত্র। তার পিছনে শস্ত্র ছাড়া আর কোনো যুক্তি নেই। জোর যার সুদ তার।

আসলটাতেই আমার অধিকার, মা সুদেষু কদাচন। কিন্তু এমনি আমার স্বভাব যে আমি নিয়মমতো সুদ পেলে আসলটা চাইনে। সুদ অর্থাৎ বঞ্চিত শ্রম আমার ঘরে আসবে, আমি তার যতটা পারি ভোগ করব, বাকীটা আর কাউকে ধার দেব। এমনি করে গড়ে ওঠে খানিকটে সঞ্চিত শ্রমকে মূল করে বিরাট বঞ্চিত শ্রমের কারবার। এর একটা পোষাকী নাম আছে। ক্যাপিটালিজম। কিন্তু এর

সত্যিকার নাম হচ্ছে ইউজরি (usury) বা হারামী। বহু ভদ্রলোক এই অভদ্র ব্যবসায় করেন। এটা করেন বলেই তাঁরা ভদ্রলোক। তাঁদের ভদ্রতার বনেদ হলো এই শোষকবৃত্তি। মানুষের অভাব না থাকলে মানুষ তাঁদের দ্বারস্থ হতো না। কিন্তু কী করবে! নিরুপায়! তাঁদেরই শর্তে তাঁদের সহযোগিতা করতে হয়। অমানুষ বলে তাঁদের সংশ্রব ত্যাগ করা চলে না। রাগ করে একটা কিছু বাধালেই অমনি বন্দুকের আওয়াজ।

হাজার হাজার বছর ধরে এই ব্যবসায় চলছে, তাই মানুষ ধরে নিয়েছে যে এইটেই স্বাভাবিক। কিন্তু তা তো নয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক সম্বন্ধ বিপদে আপদে সাহায্য করা। সেই সাহায্যের জন্যে অতিরিক্ত আদায় করাটা শ্রমের ফলে ভাগ বসানো। মানুষ মুখ ফুটে বোঝাতে পারে না, কিন্তু তার অন্তরাত্মা জানে যে এটা বঞ্চনা। সে বিদ্রোহ করতে পারলে খুশি হতো, কিন্তু করে না এইজন্যে যে তার আছে নিত্য অভাব আর প্রতিপক্ষের আছে কাবুলী লাঠি।

মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ বিষিয়ে গেছে এর দরুন। যতই কেন না আমি 'ভাই' বলে ডাকি, পূজোপার্বণে নিমন্ত্রণ করি, দুর্ভিক্ষের দিন অন্নসত্র খুলি, মাঝে মাঝে সুদ মাফ দিই, বিষের ক্রিয়া অনবরত চলেছে, এক মুহূর্ত বিরাম নেই। এ কেবল এক দেশে নয়, সব দেশে। একমাত্র ব্যতিক্রম

সোভিয়েট রাশিয়া। কিন্তু সেখানেও গবর্ণমেণ্ট থেকে প্রজার কাছ থেকে ধার নেওয়া চলিত আছে, প্রজা সুদ পায়। রাষ্ট্রের মারফৎ প্রজারা জনসাধারণের বঞ্চিত শ্রমের ভাগ পায়। সব প্রজা যদি পেত তা হলে কোনো কথা উঠত না। কিন্তু যারা পায় তাদের সংখ্যা ঢের কম, যারা দেয় তাদের সংখ্যা ঢের বেশী। সুতরাং রাশিয়া যদিও ব্যতিক্রম তবু সেখানকার সম্পন্ন প্রজারা রাষ্ট্রের বেনামীতে একদিন বিপন্ন প্রজাদের বঞ্চিত শ্রমের কারবার চালাবে বলে ভয় হয়।

এ কথা ঠিক যে ক্যাপিটালিজম যদি না থাকত তবে দেশে দেশে এত কলকারখানা গড়ে তোলা যেত না, এত রেল লাইন নদীর পুল জলসেচের নহর, এত জাহাজ মোটর-গাড়ী বিমান, এত ওষুধপত্রের দোকান। কোথায় থাকত লণ্ডন নিউ ইয়র্ক কলকাতা? সব সত্যি, কিন্তু এটাও সত্যি যে পাঁচ টাকা পরিমাণ সঞ্চিত শ্রম এসব গড়ে তুলতে পারত না, তার সঙ্গে যদি যোগ না দিত পঁচানব্বুই টাকা পরিমাণ বঞ্চিত শ্রম। সুতরাং ক্যাপিটালিজম পক্ষে যদি পাঁচ কথা বলবার থাকে তবে তার বিপক্ষে পঁচানব্বুই কথা।

কিন্তু এ ভুল আমরা করব না যে ক্যাপিটালিজমের সমস্তটাই বঞ্চনা। না, তত দূর যাব না। এতে সন্দেহ নেই যে এর মূলে রয়েছে সঞ্চিত শ্রম। যদি শুধু তাই নিয়ে কেউ কারবার করে তবে সঞ্চিত শ্রমের সঙ্গে দৈনন্দিন শ্রম

যোগ করে ন্যায়সঙ্গত শ্রীবৃদ্ধির অধিকারী হতে পারে। কিন্তু তাই যদি হতো তবে ক্যাপিটালিজমের নাম শোনা যেত না। সুদ অথবা বঞ্চিত শ্রম যোগ দিয়েছে বলেই এই কলেবরবৃদ্ধি ঘটেছে। বঞ্চনাটাকে কোনোমতেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মানুষের রক্ত শুষেই মানুষ এত লাল হয়েছে। অথচ লাল দেখতে দেখতে আমাদের চোখ যেন সব লাল না দেখে। সঞ্চিত শ্রমের শাদাটুকুও সত্য। তবে সেটুকুর নাম ক্যাপিটালিজম নয়।

ক্যাপিটালিজম হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের এমন একটা সম্বন্ধ যাতে পারস্পরিক সাহায্য নেই, যেমন আমাতে ও আমার পাড়াপড়শীতে। যাতে এক পক্ষের অভাবের সুযোগ নিয়ে অপর পক্ষ তার সঞ্চিত শ্রমকে বঞ্চিত শ্রম সহযোগে উত্তরোত্তর পরিস্ফীত করে। সেই পরিস্ফীতির পশ্চাতে থাকে আইন আদালত ও আইন আদালতের পিছনে থাকে সঙীন বন্দুক। কালক্রমে এক শ্রেণী আর এক শ্রেণীর অন্নসংস্থানের উপায় করায়ত্ত করে, উৎপাদনের উপায়গুলোর মালিক হয়। ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের কলকাটি টিপতে টিপতে যুদ্ধবিগ্রহ বাধায়। অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশগুলি গ্রাস করে। দুনিয়া জুড়ে চলতে থাকে বঞ্চিত শ্রমের ফলাও কারবার, তার মূলে অবশ্য কিয়ৎ পরিমাণ সঞ্চিত শ্রম। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ বিষিয়ে যায়। বিপ্লবের দ্বারা সেই সম্বন্ধ যাতে স্বাস্থ্যকর হয় তার জন্যে এক দল মানুষ

জান কাবুল করে। এ যাবৎ একটিমাত্র বিপ্লব সফল হয়েছে। তাও আংশিকভাবে।

এখনো একশো বছর যায়নি পৃথিবীতে দাসব্যবসায় ছিল। একটি অতি সুসভ্য দেশে সে ব্যবসা উঠিয়ে দিতে গিয়ে গৃহযুদ্ধ বাধল, নইলে সে ব্যবসা বোধ হয় এখনো চালু থাকত। মানুষের বিবেক ক্ষুব্ধ না হলে, বিবেকের তাড়নায় বহু লোক প্রাণ না দিলে কোনো অমানুষিক প্রথার উচ্ছেদ হয় না। বঞ্চিত শ্রমের ব্যবসায় উঠিয়ে দিতে গিয়ে রুশদেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ মরেছে ও মরছে, তবে তো মানুষ সে দেশে নতুন করে বাঁচছে। নতুন করে বাঁচা কথার কথা নয়।

অন্যান্য দেশে ক্যাপিটালিজম এই মহাযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে আরো শক্ত শিকড় গেড়েছে। জার্মানীর খবর রাখিনে, কিন্তু নাৎসী ব্যবস্থা যে শ্রমিকদের সবাইকে খোরাক পোষাক ও কাজ দিয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইংলণ্ডের খবর কিছু কিছু পাই, সেখানেও শ্রমিকদের প্রায় সবাই এত দিনে কাজ পেয়ে গেছে, খোরাক ও পোষাক পাচ্ছে। উপরন্তু তাদের অনেকের হাতে ফাঁপা টাকা জমেছে ও সে টাকা সরকারের মারফৎ বা ব্যাঙ্কের মারফৎ ব্যবসাবাণিজ্যে ও সরকারী যুদ্ধপ্রচেষ্টায় খাটছে। শ্রমিকস্বার্থ যে ধনিক-স্বার্থের শরিক হয়ে উঠছে এটা আমরা দীর্ঘকাল থেকে লক্ষ্য করে আসছি, বর্তমান যুদ্ধে আরো স্পষ্ট নিরীক্ষণ করছি। কী করে এটা সম্ভব হলো সে অনেক কথা, কিন্তু রুশ বিপ্লবের

পর থেকে ক্যাপিটালিজম শ্রমিকদেরকে শোষণের অংশ দিতে রীতিমতো চেষ্টা করে আসছে। সফল হয়েছেও। এমন কি এই ভারতবর্ষেও, এই যুদ্ধকালে, বহুল পরিমাণে। বিপ্লবে যে শ্রেণী নেতৃত্ব করবে সেই শ্রেণীই ক্যাপিটালিজমের স্তম্ভ হয়ে উঠছে। বিপ্লব তো একটা আকস্মিক ঘটনা নয়, তার জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হয়, লেনিন যেমন করেছিলেন অনেক বছর ধরে। সফল হবার আগে এক বার বিফল হয়েছিলেনও। ক্যাপিটালিস্ট দেশগুলিতে বিপ্লবের জন্যে প্রস্তুতি যুদ্ধেব আগে যেটুকু বা ছিল যুদ্ধকালে সেটুকুও নেই, যুদ্ধের পরেও যে হবে তার সম্ভাবনা কম। কারণ যারা বণ্ড কিনেছে ব্যাঙ্কে টাকা রেখেছে জীবনবীমা করেছে কোম্পানীর অংশীদার হয়েছে তারা এমন কিছু করবে না, অপরকে করতে দেবে না, যার ফলে ক্যাপিটালিজম বিপন্ন হতে পারে। তাদের সংখ্যা যুদ্ধের দৌলতে অগণিত। সব চেয়ে বড় কথা বিবেকের বিক্ষোভ নেই, অন্যায়বোধ নেই।

যে ব্যবস্থা যুদ্ধোত্তীর্ণ হয়েছে সেই ব্যবস্থাই যুদ্ধোত্তর ব্যবস্থা। সে ব্যবস্থা ক্যাপিটালিস্ট দেশগুলিতে ক্যাপিটা-লিজম, রাশিয়ায় কমিউনিজম। যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনাগুলিতেও এটা ধরে নেওয়া হচ্ছে। অথচ কিছুদিন আগে কত লম্বা লম্বা বুলিই না শোনা যাচ্ছিল। এ যুদ্ধের পরে নিউ অর্ডার আসছে বলে যাঁরা নিশ্চিন্ত ছিলেন তাঁরা এখন ও কথা বড় মুখে আনেন না। লোকেও ব্যাজার হয়েছে বোলন্দাজদের

বোলচাল শুনে। যাঁদের বিশ্বাস ছিল সোভিয়েট রাশিয়া যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর উপর বিপ্লব বিস্তার করবে তাঁদের বিশ্বাসের বোঁটা শিথিল হয়েছে। ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি পরাক্রান্ত দেশগুলির সঙ্গে শক্তিপরীক্ষার জন্যে রুশদেশ প্রস্তুত নয়, হতে অনেক কাল লাগবে। তাই যাঁরা যুদ্ধের বরাত দিয়ে নির্ভাবনায় ছিলেন এখন তাঁদের মনে ঘনায়মান হতাশা।

সব রাক্ষসের প্রাণ লুকোনো থাকে একটি না একটি কৌটায়। এই রাক্ষসের প্রাণ যে কৌটায় লুকোনো তার নাম মিলিটারিজম। ক্যাপিটালিজমের সঙ্গে মিলিটারিজমের সম্বন্ধ এত নিগূঢ় যে দিব্য দৃষ্টি না থাকলে দেখা যায় না। যুদ্ধের আগে, যুদ্ধের সময় ও যুদ্ধের পরে সব প্রচেষ্টাই যুদ্ধপ্রচেষ্টা। কোনোটা প্রকাশ্যভাবে, কোনোটা প্রচ্ছন্নভাবে। সব প্রচেষ্টার নাটের গুরু ক্যাপিটালিজম। কিন্তু এমনি গোপন তার ক্রিয়া যে যুদ্ধের জন্যে সব চেয়ে লাফায় জনসাধারণ। তাদের মদ্যপিপাসা মেটাতে গিয়ে শুঁড়িরা বড়লোক হয়ে যায়, তাদের রণপিপাসা মেটাতে গিয়ে কারখানাওয়ালারা। যতদিন না তাদের মদের নেশা ঘোচে তত দিন যেমন শুঁড়ির লোকসান নেই তেমনি যতদিন না তাদের যুদ্ধের নেশা কাটে তত দিন কারখানাওয়ালাদের লোকসান নেই। ব্যাঙ্কওয়ালাদেরও।

ঘনায়মান হতাশার মধ্যে আশার আলো এইটুকু যে এই যুদ্ধের পর—হয়তো এ যুদ্ধ শেষ না হতেই—জনসাধারণের

রণপিপাসা মিটবে এক শতাব্দীর মতো। নিকট ভবিষ্যতে পুনর্যুদ্ধের সম্ভাবনা নেই এটা যখন ক্যাপিটালিস্টরা হৃদয়ঙ্গম করবে তখন তাদের পরিকল্পনাই যাবে বদলে। তখন যদি তারা ক্যাপিটালিজমকে বাঁচিয়ে রাখতে চায় তা হলে নামমাত্র সুদমুনাফায় উপভোগের বস্তু উৎপাদন করবে, ধ্বংসের উপকরণ নয়।

তাদের সুদমুনাফা যখন নামমাত্র হবে তখন আর তারা শ্রমিকদের বখরা দিতে পারবে না। তার থেকে আসবে অসন্তোষ। অসন্তোষ থেকে দ্বন্দ্ব। এ দ্বন্দ্ব অহিংসভাবেও হতে পারে। রণক্লান্তির সঙ্গে এর স্বতোবিরোধ বা অসামঞ্জস্য নেই। বরং ভারতবর্ষে যে পরীক্ষা চলেছে তা যদি অব্যর্থ হয় তবে অহিংসার প্রতিপত্তি বিশ্বব্যাপী হবে। যেখানে যত সংগ্রাম সব পরিচালিত হবে অহিংস প্রণালীতে।

যে প্রণালীতেই হোক, দ্বন্দ্ব যদি ধনতন্ত্রের অবসান ঘটায় তবে তার পরের অধ্যায় মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সাহায্যের সম্বন্ধ। এর নানা রূপ। রাশিয়ায় আমরা এর যে রূপ দেখছি সে রূপ এর একমাত্র রূপ নয়। রুশ দেশে উৎপাদনের উপায়গুলো ধমিকদের হাত থেকে শ্রমিকদের হাতে যায়নি, গেছে রাষ্ট্রের হাতে। রাষ্ট্রই কল-কারখানার মালিক, জমির মালিক, ব্যাঙ্কের মালিক। বণ্টনের ব্যবস্থাও গেছে রাষ্ট্রের হাতে। দোকানবাজার রাষ্ট্রের, তবে কিছু কিছু সমবায়ের। বলা যেতে পারে

রাষ্ট্র যখন শ্রমিকদের তখন রাষ্ট্রের ধনও শ্রমিকদের ধন। শ্রমিকদের আপনার বলতে ঐ রাষ্ট্রটি। এবং গোটাকয়েক কোঅপারেটিভ ও কলেকটিভ প্রতিষ্ঠান। রাশিয়ায় শ্রমিক বলতে ভূশ্রমিকও বোঝায়, কৃষক বলে একটা স্বতন্ত্র শ্রেণী এখন বোধ হয় নেই। থাকলেও তাদের কৃষক বলে চিহ্নিত করার সার্থকতা নেই।

উৎপাদনের উপায়গুলো যদি আকারে ছোট ও প্রকারে সরল হতো তা হলে শ্রমিকদের পক্ষে সেসব পরিচালনা করা সম্ভব হতো। পরিচালন করতে করতে তারা স্বত্ববান হতো। কিন্তু একটা কামারশাল চালানো যত সোজা একটা ইস্পাতের কারখানা চালানো তত নয়। সোভিয়েট শ্রমিকরা গোড়ার দিকে সে রকম চেষ্টা করেছিল, তাতে কাজ হলো না। যে দেশের উৎপাদনের বা বণ্টনের উপায়-গুলো জটিল ও বৃহৎ সে দেশে শ্রমিকদের পক্ষে মালিক হয়ে ওঠার পথ রুদ্ধ। সে দেশে রাষ্ট্রকেই সে ভার দিয়ে শ্রমিকরা রাষ্ট্রের ভার নিতে ব্যগ্র হয়। কিন্তু উৎপাদন ও বণ্টনের উপায়গুলো যদি সরল ও সংক্ষিপ্ত হয় তবে শ্রমিকরা সরাসরি মালিক হয়ে উঠতে পারে।

আমরা দেখেছি যে ক্যাপিটালিজমের সমস্তটা বঞ্চিত শ্রমের ব্যবসায় নয়, যদিও মোটের উপর তাই। ন্যায়ের খাতিরে স্বীকার করতে হবে খানিকটে সঞ্চিত শ্রমও খাটছে। তা হলে প্রশ্ন উঠবে ক্যাপিটালিজম উঠে গেলে মালিকদের

কী দশা হবে? তারা কি ক্ষতিপূরণ পাবে? ক্ষতিপূরণ পেলেও তা নিয়ে করবে কী? খাটাবে কোথায়? এত বড় একটা শ্রেণী, যার মধ্যে বহু স্বচ্ছল শ্রমিকও আছে, নির্বিবাদে ইতিহাসের মঞ্চ থেকে প্রস্থান করবে?

না, নির্বিবাদে না। সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আমি শুধু ইশারা দিয়েছি যে বিবাদটা অহিংস হলে রক্তের অপচয় বাঁচে। নইলে রক্তাল্পতা রোগে মানুষ জাতটা মরে। বিবাদ বাধবে প্রথমতঃ ক্ষতিপূরণ নিয়ে। দ্বিতীয়তঃ ক্ষতিপূরণবাবদ যদি কিছু পাওয়া যায় তবে তা খাটানো যাবে কী করে ও কোথায়, তা নিয়ে। লেনিন ও স্টালিন এ ক্ষেত্রে আপস্ করেননি। যারা মনে করে গান্ধীজী আপস্ করবেন তারা তাঁকে চেনে না। ধনিকদের তিনি ট্রাস্টী হতে উপদেশ দিয়েছেন, এর থেকে অনেকে ধরে নিয়েছেন যে তিনি তাদের বঞ্চিত শ্রমেব ব্যবসা চালাতে দেবেন। তা নয়। সঞ্চিত শ্রমের ব্যবসা চালাতে দেওয়া হবে। আপসের ক্ষেত্র এইটুকুতেই নিবদ্ধ। মনে হয় লেনিনের নিউ ইকনমিক পলিসিও এই মর্মে আপস্। স্টালিন সে পথ মেরেছেন।

অবশ্য আমি বলতে পারিনে গান্ধীজীর মনে কী আছে। চিন্তা করতে করতে আমি কয়েকটি অনিবার্য সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি।

এক, ব্যাঙ্ক ইনশিওরেন্স ও মহাজনী কারবার রাষ্ট্রের

অধিকারে অনতে হবে। যার যখন কর্জের দরকার হবে রাষ্ট্রের দরবারে দরখাস্ত করবে। যার যত সঞ্চিত ধন সব রাষ্ট্রের কাছে গচ্ছিত রাখতে হবে। এ সত্ত্বেও যদি কেউ আর কারো কাছে ধার নেয় বা জমা দেয় তবে সুদের জন্যে নালিশ করলে সুদ পাবে না। তবে আসল পেতে পারবে। এই ব্যতিক্রমের কারণ, হঠাৎ কারুর কোনো জিনিস আবশ্যক হলে পাড়াপড়শীর কাছে ধার চাওয়া স্বাভাবিক, যেমন এক সের চাল বা এক পোয়া ঘি। এমন কত হবে। রাষ্ট্রের এতে মাথা গলানো ভুল। কিন্তু টাকাকড়ি সম্বন্ধে অন্য ব্যবস্থা সম্ভব। গ্রামে গ্রামে স্টেট ব্যাঙ্ক বা এজেণ্ট থাকতে পারে। এ কালের মহাজনরাই হবে এজেণ্ট। পারিশ্রমিক পাবে।

তুই, রাষ্ট্র কাউকে সুদ দেবে না, কারো কাছে সুদ নেবে না। এক পয়সাও না। হঠাৎ মনে হবে, তা হলে তো রাষ্ট্রের এতে লোকসান ঘটবে। না, ঘটবার কোনো কারণ নেই। যদি ঘটে তো করদাতারা পুষিয়ে দেবে। যেটা ভালো সেটার জন্যে করদাতাদের কিছু ত্যাগ স্বীকার করা ভালো। তারপর কথা উঠবে, সুদের আশা না থাকলে লোকে সঞ্চয় করবে কেন, লোকের সঞ্চয় প্রবৃত্তি জাগবে কেন? এর উত্তর, সঞ্চয় না করলে তো আপদ যায়। যার যেটুকু দরকার সেইটুকু উৎপাদন করে উপভোগ করুক। অতিরিক্ত উৎপাদন করতে কে পায়ে ধরে সাধছে! কিন্তু

অতিরিক্ত উৎপাদন করলেই তা সঞ্চয় করা উচিত। সঞ্চয় না করার নাম অপচয়। অপচয়ের প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। ফলে যদি কারুর উৎপাদন প্রবৃত্তি না জাগে তবে তার সম্পত্তি কোর্ট অফ ওয়ার্ডসে নিয়ে তাকে ম্যানেজার করে দেওয়া যাবে। ম্যানেজার হিসাবে তাকে খাটতে, জবাবদিহি করতে হবে।

তিন, কৃষি ও শিল্প থেকে উৎপাদনের একটা মিনিমাম্ বেঁধে দিতে হবে। উৎপাদন যদি মিনিমামের নীচে নামে তবে উৎপাদনের অধিকার সাময়িক ভাবে কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের হাতে যাবে। কোর্ট অফ ওয়ার্ডস এখন কেবল জমিদারদের জন্যে। ভবিষ্যতে সকলের জন্যে। কামার কুমোর চাষী ছুতোর কেউ বাদ যাবে না।

চার, ইতিমধ্যেই রেশন প্রথার কল্যাণে লোকের উপভোগের পরিমাণ স্থির হয়ে যাচ্ছে। পরে উপভোগের একটা ম্যাক্‌সিমাম বেঁধে দিতে হবে। কেউ যদি তার চেয়ে বেশী উপভোগ করে তবে সমাজ সেটা সহ্য করবে না। আইনে তার প্রতিবিধান থাকবে।

পাঁচ, উৎপাদন ও উপভোগের দাঁড়িপাল্লা ঠিক রাখার জন্যে বন্টনের নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রই করবে। ইতিমধ্যে করতে আরম্ভ করেছে।

রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ এই পর্যন্ত ; এর বেশী না। আমি অন্তরে অন্তরে নৈরাজ্যবাদী। রাষ্ট্রকে আমি প্রকৃত

স্বাধীনতার পরিপন্থী মনে করি। কিন্তু ক্যাপিটালিজমের পরবর্তী অধ্যায় নৈরাজ্যবাদ নয়। তার জন্যে আরো দু'এক শতাব্দী অপেক্ষা করতে হবে। এই দু'এক শতাব্দী রাষ্ট্রের আশ্রয় নিতে হবে। তা বলে রাষ্ট্রকে বেশী বাড়তে দেওয়া চলে না। তাতে উল্টো বিপত্তি। রাষ্ট্রের ক্ষমতারও সীমা বেঁধে দিতে হবে। একদিকে মিনিমাম, আরেক দিকে ম্যাক্সিমাম।

মিলিটারিজমের ভূত যেমন আমাদের ঘাড়ে চেপে বসেছে তেমনি যন্ত্রপাতির ভূত। মানুষ বড়, না যন্ত্র বড়? মানুষ বড়। তা যদি হয় তবে যন্ত্রের উপর কঠোব হতে হবে। যন্ত্রের প্রয়োজন সীমাবদ্ধ করতে হবে। রেল স্টীমার এরোপ্লেন আমার দরকার, সুতরাং যেসব কারখানায় সেসব তৈরি হয় সেসব কারখানাও দরকার। কিন্তু এ যুক্তি কি কাপড়ের বেলায় খাটে? কাপড় তো মানুষ বিনা কারখানায় বুনতে পারে, চিরকাল বুনে এসেছে, এখনো বুনছে। প্রগতির দোহাই দিয়ে কাপড়ের কল পত্তন করার অর্থ তাঁতীর হাত থেকে উৎপাদনের উপায় কেড়ে নেওয়া। এ কর্ম ক্যাপিটালিজমই করুক, কমিউনিজমই করুক, এর পিছনে যুক্তি নেই, আছে তাঁতীকে পিষে মারার দুর্মতি। তাকে ভিটেছাড়া করে বস্তিতে বসিয়ে মেকানিক বা মিলহ্যাণ্ড বানিয়ে প্রগতির চূড়ায় চড়ালে মানবসভ্যতা হনুমানব সভ্যতায় পরিণত হয়, উন্নতির শিখরে ওঠে না। এর চেয়ে

ঢের বড় আদর্শ, তাকে তার উৎপাদনের উপায়গুলোর মালিক ও পরিচালক হতে দেওয়া, নিজের বাড়ীতে নিজের ছেলেমেয়ের সঙ্গে কাজ করতে দেওয়া, পাড়াপড়শীর সঙ্গে আদানপ্রদানের স্বাধীনতা ভোগ করতে দেওয়া।

কাপড়ের কারখানা মানুষের জন্যে নয়। মানুষ তার জন্যে। সুতরাং কাপড়ের কারখানা বন্ধ করতে হবে। কাপড়ের মতো আরো যত জিনিস বিনা কারখানায় বানানো সম্ভব সেসব বিনা কারখানায় বানাতে হবে, তার দরুন কারখানার দরকার নেই। যদি তেমন কোনো কারখানা থাকে তবে সেগুলো বন্ধ করতে হবে। প্রগতির অর্থ তাঁতীকে তার উৎপাদনের উপায়গুলোর মালিক ও পরিচালক হতে দিয়ে সংঘবদ্ধ করা ও আধুনিক প্রণালী শেখানো। সে যদি কাঠের তাঁতের বদলে লোহার তাঁত ব্যবহার করতে চায়, বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্য নিতে চায়, তবে সে ব্যবস্থা একদিন হবে। কিন্তু সে ব্যবস্থা তাঁতীকেই বড় করবে, তাঁতকে নয়। এখানে বলে রাখতে পারি তাঁতী নামটা সেকেলে। আমার ওটা পছন্দ হয় না। সংস্কৃত বা ইংরেজী অভিধান খুলে আর একটা নাম বার করতে হবে। তেমনি কামার কুমোরের বেলা, চামার ছুতোরের বেলা। প্রগতি এই রেখা ধরে চলুক। কিন্তু বেচারাদের উৎপাদনের উপায়গুলো কেড়ে নিয়ে হাত পা কেটে যন্ত্রের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার অর্থ প্রগতি নয়, গো-গতি। যে গতি হয় গোরুর

গাড়ীর গোরুর, লাঙলের গরুর। কোনো রকম 'ইজম' দিয়ে এ দুর্গতি ভোলানো যায় না।

তাঁতীদের সম্বন্ধে যা বলেছি চাষীদের সম্বন্ধেও তাই বলব। তাদের যদি সুবিধা হয় তারা ট্র্যাক্টর কিনতে পারে, রাষ্ট্রের যদি প্রয়োজন থাকে রাষ্ট্র তাদের ট্র্যাক্টর জোগাতে পারে। কিন্তু বেচারাদের জমিজমা কেড়ে নিয়ে, মজুর বানিয়ে, ট্র্যাক্টরের সঙ্গে বলদের মতো জুতলে যা হবে তা প্রগতি নয়, গো-গতি। হয়তো তার ফলে উৎপাদন বাড়বে, কিন্তু কোনো মতে উৎপাদন বাড়ানোই মানব সভ্যতার শেষ কথা নয়। কিসে মনুষ্যত্ব বাড়ে সেটা দেখতে হবে। মানুষ বড় না উৎপাদন বড়? মানুষ বড়।

উৎপাদনের উপায়গুলো চাষীদের হাতেই ছেড়ে দিতে হবে, যাদের হাতে নেই তাদের হাতে পৌঁছে দিতে হবে; অধিকন্তু মালিকী স্বত্ব যাতে তাদের হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে। যদি তারা জমির বা গরুর বা বীজের বা সারের উপযুক্ত ব্যবহার না করে তবে কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্ থেকে পরিচালনার ভার নেওয়া হবে। কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্ বলতে এতকাল যা বুঝেছি ভবিষ্যতে তার উপর আরো কিছু বুঝব। অযোগ্য চাষীকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না, কিন্তু কয়েকজন অযোগ্য চাষীর অপরাধে যেন চাষীমাত্রেরই উৎপাদনের উপায় রাষ্ট্রসাৎ না হয়।

উৎপাদনের উপায়গুলো প্রাইভেট হাতে রাখলে

পাবলিকের যদি অসুবিধা হয় তবে নিয়ন্ত্রণের অধিকার পাবলিক নিক। কিন্তু মালিকী স্বত্ব পাবলিকের হাতে যাবার কোনো ন্যায়সঙ্গত কারণ নেই, যদি না প্রমাণিত হয় যে কারবারটা বঞ্চিত শ্রমের। চাষী তো কাউকে বঞ্চিত করে না। বড় বড় চাষীরা করে, কিন্তু তাদের সংখ্যা বেশী নয়। তাদের বঞ্চনা রহিত করা হোক। ছোট ছোট চাষীদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ তারা অপদার্থ, তাদের মর্জির উপর নির্ভর করলে দেশের লোক অল্পাহারী হতে বাধ্য। এর প্রতিকার, তাদের জমি জোগানো, গরু জোগানো, বীজ জোগানো, সার জোগানো, শিখিয়ে পড়িয়ে গড়ে পিটে দোরস্ত করা। শুধু মালিকী স্বত্ব দিলেই তারা সোনা ফলাবে না, পিছনে লেগে থাকা দরকার। কিন্তু উৎপাদনের উপায়গুলো প্রাইভেট হাতে রাখতে হবে, যেমন তাঁতীর বেলায় তেমনি চাষীর বেলায়।

উৎপাদন পদ্ধতিকে অযথা জটিল করা যদি প্রগতি হয় তবে আমি সে প্রগতির পক্ষে নই। কারণ, উৎপাদন পদ্ধতিকে অতি জটিল হতে দিলে উৎপাদনের উপায়গুলো উৎপাদকের হাতছাড়া হয়, যাদের হাতে গিয়ে পড়ে তারা হয় ক্যাপিটালিস্ট নয় রাষ্ট্রসচিব। ব্যতিক্রম হিসাবে এর সমর্থন করা যায়, কিন্তু সমাজ গড়ার বনেদ হিসাবে এর উপর নির্ভর করা যায় না। ক্যাপিটালিস্টরা উৎপাদন পদ্ধতিকে অনাবশ্যক জটিল করে তুলেছে তাদের আবশ্যকের দিক

থেকে। অর্থাৎ ওতেই তাদের লাভ বেশী, খরচ কম। কমিউনিস্টরাও যে ওকে অবশ্যম্ভাবী বলে স্বীকার করে নেয় এটা ওদের যন্ত্রোপাসনার পরিণাম। যন্ত্রকে মানুষের চেয়ে বড় হতে দিলে একদিন সমাজের ভিৎ টলবে। তখন ইতিহাসের মঞ্চ থেকে কমিউনিজমকেও প্রস্থান করতে হবে ক্যাপিটালিজমের মতো।

উৎপাদন পদ্ধতিকে উৎপাদকের আয়ত্তের মধ্যে রাখতে হবে। আয়ত্তের মধ্যে রেখে যতটা প্রগতি সম্ভব ততটা হোক। বাষ্প বিদ্যুৎ প্রভৃতি অভিনব শক্তির সাহায্য নেওয়াটা খারাপ নয়, কিন্তু উৎপাদকের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখাটা ভালো। এ দিক থেকে চিন্তা করলে দেশের চোদ্দ আনা শিল্প উৎপাদকের হাতে তুলে দেওয়া উচিত, বাকী দু' আনা রাষ্ট্রের হাতে বা রাষ্ট্রের অনুমতি নিয়ে ধনিকদের হাতে। যার হাতে যা পড়বে সে তার মালিকও হবে। এর মানে, দেশে বড় বড় কারখানা গুটিকয়েক থাকবে, ছোট ছোট কারখানায় দেশে ছেয়ে যাবে। এতে ক্যাপিটালিস্ট ও কমিউনিস্ট উভয়ের অপত্তি। কিন্তু দেশের চোদ্দ আনা লোকের শ্রীবৃদ্ধি। যে সব দেশ মানুষকে বড় না করে যন্ত্রকে বড় করেছে, পদ্ধতিকে বড় করেছে, সুদ ও মুনাফাকে বড় করেছে তাদের পতন ঘটবেই। ভারত যদি সে পতন এড়াতে চায়, যদি উপস্থিত পতনের গতিরোধ করতে চায় তা হলে মানুষকে বড় করতে হবে, আর সমস্তকে ছোট।

এই ভাবে গোড়া বাধলে আমাদের সমাজব্যবস্থা বহু শতাব্দী দৃঢ় থাকবে, তার চূড়ায় গুটিকয়েক ময়ুরপুচ্ছ শোভা পেলেও। ক্যাপিটালিস্টদের ছেঁটে ফেলার দরকার নেই, কিন্তু সত্যিকারের ক্ষমতা জনসাধারণের ভিতর ছড়িয়ে দিতে হবে উৎপাদক তথা পরিচালক তথা মালিকরূপে। কাজ নেই আমাদের উন্নত প্রণালীর উৎপাদনে, আমরা চাই ওর সম্মোহন কাটাতে।

সম্মোহন কাটানো কঠিন, কেননা যন্ত্রপাতির কল্যাণে ভোগসম্ভার প্রচুর তথা·সুলভ হয়েছে, তা সে কাপড়ই হোক আর করোগেট লোহাই হোক। উৎপাদকের চোখে কাপড়ের কল খারাপ, কারণ তার দরুন বহু লক্ষ কাটুনী ও তাঁতী বেকার। কিন্তু উপভোক্তার চোখে কাপড়ের কল ভালো, কারণ তার আশীর্বাদে কোটি কোটি লোক ধুতি শাড়ী কামিজ শেমিজ পরতে পাচ্ছে সস্তায়। উৎপাদকের চেয়ে উপভোক্তার সংখ্যা বেশী। তাই কাপড়ের কল, তেলের কল, চালের কল, চিনির কল অনায়াসে বেকার সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে।

একবার আমি চরকা সংঘের কাটুনীদের দেখতে গেছলুম। সুতো কেটে তারা সংঘের কাছ থেকে মজুরি পায় কতক টাকায়, কতক কাপড়ে। কাপড় অবশ্য তাদেরই সুতোর কাপড়, বাজারে তার দাম মিলের কাপড়ের চেয়ে বেশী। তারা বলে, "কাপড় না দিয়ে আমাদের টাকাই দিও, বাবু।

আমরা ও টাকায় মিলের কাপড় কিনব, একখানার জায়গায় তু'খানা পরতে পাব।" অর্থাৎ উপভোক্তা হিসাবে তারা মিলের কাপড়ের পৃষ্ঠপোষক। সবাই যদি তাই হতো তবে তাদের সূতো কিনতে কে? তারা যে মিলের কাপড় কেনবার সঙ্গতি জোটাতে পারত না। না খেয়ে মরত। তাদের সৌভাগ্যক্রমে তাদের চরকার সূতোর কাপড় তু'দশ হাজার দেশপ্রেমিক চড়া দামে কেনে, তাই তারা চরকা সংঘের কাছ থেকে খোরাকও পায়, পোষাকও পায়।

উপরে যে উদাহরণটি দিলুম তার থেকে বোঝা যায় কেন আমাদের দেশের উৎপাদকরা দেড় শতাব্দীর মধ্যে উজাড় হতে বসেছে। উপভোক্তা হিসাবে তারা কলের সম্মোহনে মজেছে, তাদেরই মতো আর সকলে। তাই তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা নেই। যদি থাকে, অতি সামান্য। নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুড়ুল মেরেছে। দেশপ্রেমিকরা চড়া দাম দিয়ে তাদের বাঁচিয়ে রাখতে পারে না, যদি না তারা নিজেরা নিজেদের উৎপন্ন দ্রব্য ভোগ করে। যে যা উৎপাদন করে তার চেয়ে সস্তা খুঁজতে গেলেই মরণ। মিলের কাপড় কিনলে তাঁতী আত্মঘাতী হয়। এবং আর একটু বুদ্ধি খাটালে এও পরিষ্কার বোঝা যায় যে উৎপাদকরা পরস্পরের উৎপন্ন দ্রব্যের উপভোক্তা না হলে পরস্পরকে মেরে সাবাড় করে দেয়।

এতক্ষণ সস্তার বিরুদ্ধে বলেছি। প্রাচুর্যের বিরুদ্ধেও

বলবার আছে। চরকা সংঘের সেই কটুনীরা মিলেব কাপড় কিনতে চেয়েছিল শুধু সস্তা বলে নয়, প্রচুর বলে। অর্থাৎ একখানার জায়গায় দু'খানা বলে। কিন্তু আরো পরিশ্রম করে সুতো কাটলে তারা হয়তো খাদির কাপড়ও একখানার জায়গায় দু'খানা পেতো। আরো পরিশ্রম করাই এর প্রকৃষ্ট সমাধান। কিন্তু কে এত পরিশ্রম করে যদি কম পবিশ্রমে একখানার জায়গায় দু'খানা পাওয়া যায়! যন্ত্র আমাদের মাথায় এই দুর্বুদ্ধি ঢুকিয়ে দিয়েছে যে আমাদের অত না খাটলেও চলে, যন্ত্রই আমাদের একখানার জায়গায় দু'খানা দেবে। কেবল চরকা সংঘেব কাটুনী নয়, প্রত্যেক উৎপাদনক্ষম স্ত্রীপুরুষের মনোভাব এই রকম। মধ্যবিত্ত পরিবারে যতগুলি মুখ থাকে ততগুলি হাত থাকে না, যারা পরিশ্রম করতে পারে তারা করে না, কিম্বা কম করে। অভাব পূরণের জন্যে তারা কথায় কথায় বাজারে লোক পাঠায়, সস্তায় প্রচুর কিনে দেশের তাঁতী প্রভৃতি উৎপাদকদের বেকার করে। তাব পবে নিজেবা যখন বেকার হয় তখন কেঁদে ভাসায়।

এদেশে সবাই সবাইকে বেকাব বানায়। দোয কেবল মধ্যবিত্তদের নয়, উপভোক্তা মাত্রেরই। এর মূলে রয়েছে সস্তার লোভ, প্রাচুর্যের কুহক, প্রগতির মোহ। যে যা উপভোগ করে সে যদি স্বয়ং উৎপাদন করে কিম্বা নিজের উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে প্রতিবেশীর দ্বারা উৎপাদন করিয়ে

নেয় তা হলে কাউকে বেকার বসে থাকতে হয় না। এবং পরিশ্রমের মাত্রা বাড়ালে প্রাচুর্যেরও পথ খোলা থাকে। আর সস্তা বলে যে কথাটা বাজারে চলতি হয়েছে সেটা প্রকৃতপক্ষে ভাইয়ের গলায় ছুরি দেওয়া। উপভোক্তা যদি দু' পয়সা সস্তায় কেনে তবে উৎপাদকেব দু' পয়সা লোকসান হয়, যদি না সে দুধে জল মেশায়। আজকের বাজারে আমবা উৎপাদকদের কারসাজি দেখে স্তম্ভিত হচ্ছি। কিন্তু কে তাদের এসব অপকর্ম করতে এতকাল শিখিয়ে এসেছে? যারা সস্তার নামে উৎপাদকদের বঞ্চিত করেছে বা করতে চেয়েছে।

উৎপাদন ও উপভোগ সম্বন্ধে আমি কয়েকটি অনিবার্য সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। সেগুলি একে একে পেশ করি।

এক, প্রত্যেক সমর্থ ব্যক্তি কিছু না কিছু উৎপাদন করবে। এমন কি অন্ধ, পঙ্গু, কুষ্ঠী, জখমীরাও।

দুই, যে যা উৎপাদন করবে সে তার কতক স্বয়ং উপভোগ করবে। অবশ্য সব ক্ষেত্রে এটা সম্ভব নয়। ক্ষেত্রবিশেষে এব ব্যতিক্রম ঘটবে। প্রত্যেক নিয়মেরই ব্যতিক্রম স্বীকার করতে হয়।

তিন, যে যা উপভোগ করবে সে তার কতক স্বয়ং উৎপাদন করবে। এ নিয়মেরও ব্যতিক্রম সহ্য করা যায়।

চার, সমষ্টির উৎপাদনের সঙ্গে সমষ্টির উপভোগ সমতা

রক্ষা করবে। ঘুরিয়ে বললে, সমষ্টির উপভোগের সঙ্গে সমষ্টির উৎপাদন সমতা রক্ষা কবে।

পাঁচ, সমষ্টি বলতে প্রথমে গ্রাম বা শহর বুঝতে হবে। তার পরের ধাপ জেলা বা অঞ্চল। তার পরের ধাপ প্রদেশ। তার পরের ধাপ স্বদেশ। এবং শেষের ধাপ পৃথিবী।

ছয়, উৎপাদকরা উপভোক্তাদের বঞ্চনা করবে না ছলে বলে কৌশলে।

সাত, উপভোক্তারা উৎপাদকদের বঞ্চনা করবে না ছলে বলে কৌশলে।

আট, যাতে পরস্পরকে বঞ্চনা করা কঠিন হয় তার জন্যে বিনিময়ের ব্যবস্থা বদলাতে হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বার্টার বা দ্রব্যবিনিময় চলবে। অল্প ক্ষেত্রেই টাকার ব্যবহার। যে সব ক্ষেত্রে টাকার ব্যবহাব অনুমোদিত হবে সে সব ক্ষেত্রে দর বেঁধে দেওয়া দরকার। বেশী দরে কিনলেও দণ্ড, বেচলেও দণ্ড। কম দামে বেচলেও দণ্ড, কিনলেও দণ্ড। সস্তার বাজারে কিনে আক্রার বাজারে বেচা বেআইনী হবে। কেনাবেচাব একই দাম, নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক। অর্থাৎ দোকানদার যে দামে কিনেছে সেই দামেই বেচবে, তার উপর শত করা দশ টাকা পারিশ্রমিক নেবে। পারিশ্রমিক অর্থে এখানে দোকানভাড়া কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদি সব কিছু বুঝতে হবে।

নয়, বিনিময়ের কাজ যারা করবে তারা যে উৎপাদনের

কাজ থেকে একেবারে নিষ্কৃতি পাবে তা নয়। যেমন উপভোগ করবে তেমনি উৎপাদন করবেও। তবে যেহেতু তারা বিনিময়েই অধিকাংশ সময় ব্যাপৃত সে হেতু উৎপাদনের বেলায় কিছু কিছু মাফ পাবে। পক্ষান্তরে উৎপাদকরাও যাতে বিনিময়ের কাজে ব্রতী হয় তার জন্যে সমবায় গঠন করতে হবে। এবং উপভোক্তারাও যাতে বিনিময়ের কাজে যোগ দেয় তার জন্যে তাদেরও সমবায় চাই।

এই সমস্ত সিদ্ধান্তের পিছনে একই তত্ত্ব কাজ করছে। কেউ কাউকে বঞ্চনা করবে না, করতে পাবে না। শ্রমিকরা যে ধনিকদের দ্বারা বঞ্চিত হয়ে থাকে এটা প্রায় সর্ববাদী-সম্মত। কিন্তু সমাজে সেই একমাত্র বঞ্চনা নয়। উৎপাদনে, উপভোগে, বিনিময়ে, বণ্টনে বহুবিধ বঞ্চনার প্রচলন রয়েছে। যারা বঞ্চিত তারাও পরোক্ষে বঞ্চক। তারা জানেও না যে তারা অপরের অন্ন নিচ্ছে। ল্যাঙ্কাশায়ার ও আহমদাবাদ এখনো বাংলার তাঁতীদের নির্বংশ করতে পারেনি, এখনো এদেশে শত শত তাঁতী আছে। কিন্তু যারা আছে তারা চরকার সূতো ব্যবহার করে না, সূতো কেনে বিদেশ থেকে, কিম্বা দেশী মিল থেকে। লক্ষ লক্ষ কাটুনীকে তারা বেকার করেছে এবং এটাও একপ্রকার বঞ্চনা বা বঞ্চনার প্রশ্রয়।

তারপর উপভোক্তা হিসাবে তুমি আমি প্রতিদিন যে পাপ করছি তার তুলনা নেই। আমরা সস্তা ও সুপ্রচুর ভোগসম্ভার চাই, যারা সস্তায় দিতে পারে না বা প্রচুর তৈরি

করতে পারে না তাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি পড়ে না, তাদের আমরা পায়ের তলার পোকার মতো না দেখে মাড়িয়ে যাই, যখন তারা মরে তখন গবর্ণমেণ্টকে গালাগাল দিয়ে কর্তব্য সমাধা করি। এটাও একপ্রকার বঞ্চনা। বা বঞ্চনার প্রশ্রয়।

সমাজকে নতুন করে গড়তে হলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো প্রকার বঞ্চনা বরদাস্ত করা চলবে না। ক্যাপিটালিস্টরাই একমাত্র দোষী নয়, দোষী আরো অনেকে, এবং শ্রমিকরাও, কারণ তারা অন্যায়ের সহযোগী হয়ে অন্যায়কে বিরাট হতে দিয়েছে। দোষ ও দোষীদের চুলচেরা বিচার না করে এখন থেকে এমন এক ব্যবস্থার পরিকল্পনা করতে হবে যাতে বঞ্চনাব উপায় না থাকে। এর জন্যে প্রত্যেককে কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। শ্রম স্বীকার করতে হবে, অল্পে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। যন্ত্রের দৌলতে সস্তায় প্রচুর ভোগসম্ভার পাব, পারতপক্ষে খাটব না, পরকে খাটিয়ে নেব, এসব দুষ্টবুদ্ধি ছাড়তে হবে। হয়তো এতে আমাদের প্রগতির অভিমানে আঘাত লাগবে, বিলাসব্যসনে ব্যাঘাত জন্মাবে, ভদ্রতা রক্ষা করা চলবে না। কিন্তু কোটি কোটি অনাহারী অল্পাহারী গৃহহীন জীর্ণবসন রোগে শোকে জর্জরিত দেশবাসী নরনারী নতুন করে বাঁচবে। অথচ বিপ্লবে প্রতিবিপ্লবে লক্ষ লক্ষ মহাপ্রাণী আহত ও নিহত হবে না।

বণ্টন সম্বন্ধে আমি এখনো মনঃস্থির করতে পারিনি, আমার কোনো স্থির সিদ্ধান্ত নেই। এ সমস্যা এত জটিল যে কোনো দেশে এর কোনো সুচিন্তিত সমাধান হয়েছে কি না সন্দেহ। এমন কি রাশিয়াতেও হয়নি।

রাশিয়াতেও সকলের উপার্জন সমান নয়। যার উপার্জন বেশী তার ক্রয়ক্ষমতাও বেশী, বাজারে মাছ দেখলে সে বেশী দাম দিয়ে মাছটা ছোঁ মেরে নেবে, যার ক্রয়ক্ষমতা কম সে হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখবে। বণ্টনকে যদি ক্রয়ক্ষমতার উপর ছেড়ে দেওয়া যায় তবে পাড়ার অনেকের ববাতে মাছ জুটবে না। অগত্যা মাছেরও রেশন করতে হয়। একে একে সব জিনিসেরই যদি রেশন কবা হয় তবে অতিরিক্ত ক্রয়ক্ষমতা নিয়ে মানুষ করবে কী? কেনই বা অত উপার্জন করবে? কম পরিশ্রমে কম উপার্জন করলেই বা ক্ষতি কী? সমাজের দশ বিশ হাজার লোক যদি কম পরিশ্রম করে তা হলে ভোগসামগ্রীর উৎপাদন কমে যায়। বাজাবে মাছ যা আসে তা সকলের মধ্যে সমভাগ করলে প্রত্যেকের পাতে এক টুকরো পড়ে। কাপড় যা আসে সমভাগ করলে প্রত্যেকের হিস্‌সায় এক গজ।

অতএব উৎপাদকদের উৎসাহ দেওয়া চাইই, নইলে উপভোক্তাদের সকলের উপোস। সব জিনিস রেশন করতে নেই। অনেক জিনিষ ক্রয় ক্ষমতার উপর ছেড়ে দিতে হবে। ক্রয়ক্ষমতা যখন রাশিয়ার মতো সমাজেও অসমান তখন 'অন্যে

পরে কা কথা'! বার্ণার্ড শ প্রত্যেকের আয় সমান করতে বলেন, কিন্তু অন্যান্য সাম্যবাদীরা তা বলেন না। আমরাও রাতারাতি সকলের ক্রয়ক্ষমতা সমান করে দিতে পারব না। তবে আমরা মোটা ভাত, মোটা কাপড়, রোগীর ওষুধ পথ্য, ক্রয়ক্ষমতার বাইরে রাখব ও যার যেমন প্রয়োজন তাকে তেমন দেব। পানীয় জল যেমন প্রত্যেকের পাওনা মোটা ভাত মোটা কাপড় ও রোগীর ওষুধ পথ্যও তেমনি। ইচ্ছা করলে রাষ্ট্র এসব স্বহস্তে নিতে পারে। অর্থাৎ কৃষকরা যা উৎপাদন করবে তা রাষ্ট্রকে বিক্রয় করবে, রাষ্ট্র রেশন প্রথায় বণ্টন করবে। তাঁতী যা উৎপাদন করবে তা রাষ্ট্রকে বিক্রয় করবে, রাষ্ট্র বণ্টনের দায়িত্ব নেবে। ওষুধপত্রের বেলায়ও তাই। কিন্তু আমরা যদি বিজ্ঞ হই আমরাই এর সুবন্দোবস্ত করতে পারবে। রাষ্ট্রের উপর নিয়ন্ত্রণের ভার দিয়ে বেচাকেনা আমরা সমবায়ের উপর, ব্যবসাদারের উপর, ন্যস্ত করতে পারি। তারাই রেশন অনুসারে বণ্টন করবে।

পানীয় জলের মতো পানীয় দুধ যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করতে হবে। রাষ্ট্র যদি এ দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেয় আমি দু' হাত তুলে আমার ডবল ভোট দেব। মোটা ভাত খেয়ে শিশুরা বাঁচবে না, বাঁচলেও তাদের পুষ্টির অভাব ঘটবে। আমরা এখনো ময়রার দোকান খোলা রেখেছি, নিজেরাই সন্দেশ রসগোল্লা গিলছি। শহরের বা গ্রামের শিশুদের

জন্যে আমাদের মাথাব্যথার কথা কোনো পত্রিকায় পড়িনি, সভায় শুনিনি।

দুধের সরবরাহ করতে গিয়ে হয়তো দেখা যাবে যে দেশে দুগ্ধবতী গাভীর অপ্রতুল। দীর্ঘকাল রেশনের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। দুধ, ঘি, মাখন, ছানা, দই এসব নইলে আমার মতো নিরামিষাশীরা আধমরা হয়ে কারুর কোনো কাজে লাগবে না। অন্তত নিরামিষাশীদের খাতিরে এগুলো রেশন করা দরকার হবে।

তার পরে মাছ মাংস। জনকয়েক ভাগ্যবান যদি এসব টাকার জোরে ছোঁ মেরে নেন তা হলে বহু লোকের পুষ্টিকর আহার জোটে না। পুষ্টির অভাব ঘটলে উৎপাদনও নিম্নমুখী হবে। এ ক্ষেত্রেও রেশনের প্রয়োজন হতে পারে। গ্রামের লোক যদি ঘরে ঘরে মুর্গী ছাগল পোষে, গ্রামের পুকুরগুলোয় যদি জোট বেঁধে মাছ ছাড়ে ও পালা করে পাহারা দেয়, তা হলে রেশন যা করবার তা ওরা নিজেরাই করবে। বণ্টনের ভার রাষ্ট্রকে নিতে হবে না। কিন্তু শহরের কথা স্বতন্ত্র। সেখানে মুর্গী ছাগল পোষা, মাছ ছাড়া ও পাহারা দেওয়া খুব সোজা নয়। ছোট ছোট শহরে এ পরীক্ষা চলতে পারে। বড় বড় শহরে পদ্মার মাছ, সমুদ্রের মাছ, আমদানি করা ছাড়া উপায় নেই। তেমনি বাইরে থেকে মুর্গী ছাগল ইত্যাদি।

ডাল তরকারি রেশন করা দরকার হতে পারে। তেল

নুন লক্‌ড়ি রেশন করা চাইই। যেখানে লক্‌ড়ি মেলে না সেখানে কয়লা। কিন্তু ঘুঁটে পোড়ানো বন্ধ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে গোবরের গতিবিধির উপর প্রখর দৃষ্টি দরকার। গোবর হচ্ছে মাটির খোরাক, আগুনের নয়। আগুনের খোরাক কয়লা বা লক্‌ড়ি। কিন্তু লক্‌ড়ি সম্বন্ধেও সাবধান হবার সময় এসেছে। চোখের সামনে বড় বড় গাছগুলোকে কাটা হয়ে চালান হতে দেখছি। এ রকম চলতে থাকলে দেশে অনাবৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। তখন ভেউ ভেউ করে কাঁদলে কী হবে! এখন থেকেই গাছ লাগাতে হবে। প্রত্যেক গ্রামের চার দিকে একটুখানি অরণ্য সৃষ্টি করা উচিত। যাকে জঙ্গল বলে তা নয়। জঙ্গল তো আপনি গজায়। আমরা চাই ফরেস্ট। যা বৃষ্টিকে টানবে, মাটির পলিকে ধুয়ে যেতে দেবে না, শিকড় দিয়ে আটকাবে, প্রয়োজন মাত্র জ্বালানী কাঠ জোগাবে। আবার আমাদের আরণ্যক হওয়া অপরিহার্য হয়েছে।

এই কৃষিপ্রধান দেশে অন্ন সম্বন্ধে আমাদের তেমন উৎকণ্ঠা নেই, উৎকণ্ঠা শিল্পজাত দ্রব্যের জন্যে। কৃষির উন্নতি তা বলে উপেক্ষা করা যায় না, খরচ করতে হবে কৃষির পিছনেই সব চেয়ে বেশী। কৃষি বলতে গোপালনও বোঝায়, মৎস্য পালনও, মুর্গী পালনও। যেসব পণ্ডিত কৃষিকে গৌণ স্থান দেন তাঁরা বুঝতে পারেন না যে উৎপাদকের খোরাকে

টান পড়লে উৎপাদনেও ঘাটতি ঘটবে। শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনে। অতএব কৃষি আগে, তার পরে শিল্প।

শিল্পের মধ্যে কোনটা মুখ্য কোনটা গৌণ তা নিয়েও পণ্ডিতদের সঙ্গে আমাদের মতভেদ। তাঁরা ভাবছেন ভারী ভারী শিল্পের কথা। আমরা ভাবছি হালকা শিল্পের কথা। ভাতের পরেই মানুষ খোঁজে কাপড়, কাপড় ভারতের মেয়েরা ঘরে বসেই সরবরাহ করতে পারে। দাও তাদের তুলো, তুলো ধোনার সরঞ্জাম, চরকা ও তাঁত। মণিপুরে ও উত্তর আসামে মেয়েরাই ঘরে ঘরে সূতো কাটে, কাপড় বোনে, এক হাতে খাওয়ায়, অনেক হাতে পরায়। যে কাজ মেয়েরা ঘরে বসেই পারে সে কাজ কেনই বা মিল ফ্যাক্টরিতে করাতে হবে, কেনই বা মিল ফ্যাক্টরির জন্যে যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করানোর জন্যে আবো ভারী ভারী কারখানা দরকার হবে? গোড়া কেটে আগায় জল যে কিসের অর্থনীতি তা তো মন বোঝে না। এটা কি তা হলে অর্থনীতি নয়, কুসীদপ্রীতি? না যন্ত্রতন্ত্রে অগাধ বিশ্বাস, প্রগতির নামে ভানুমতীর খেল?

বণ্টনের কথা হচ্ছিল। বণ্টনে এক প্রকার সাম্য আসবে যদি ভাত ও কাপড় এই দুটোকে সকলের সহজলভ্য করে তোলা যায়। কৃষির পিছনে সব চেয়ে বেশী খরচ করতে হবে, তার পরে তাঁত চরকা ও তুলোর পিছনে। মেয়েদেরকে গ্যারান্টি দিতে হবে যে তাদের উৎপন্ন সূতো ও কাপড় রাষ্ট্র

কিংবা রাষ্ট্রের অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান উপযুক্ত মূল্যে ক্রয় করবে, ক্রয় করে দেশময় রেশন করবে। কিন্তু একটা অংশ মেয়েরাই ফিরে পাবে মূল্যের বদলে বা মূল্য হিসাবে।

আগে খোরাক, তার পরে পোষাক, তার পরে বাসা। দেশে বাসস্থানের অকুলান নেই, তবু কোটি কোটি লোক কুঁড়ে ঘরে বা গাছতলায় থাকে। গাছতলা কথাটা আমার কল্পনা নয়। কিছু দিন আগে রোজ চোখে পড়ত। সম্প্রতি বৃষ্টি নেমেছে, প্রবাসী দিন-মজুরের দল নিজেদের গ্রামে ফিরে গেছে। বর্ষা ঋতুর পর ওরা আবার কাজকর্মের চেষ্টায় বেরোবে, তখন গাছতলাই ওদের আশ্রয়। ভাগ্যে গাছগুলো আপনা আপনি গজিয়ে এত বড় হয়েছে, আমরা তাদের ক'টাই বা লাগিয়েছি!

পথে পথে গাছ লাগাতে হবে, আশ্রয়ের জন্যে। কুয়ো খুঁড়তে বা পুকুর কাটাতে হবে, নলকূপ বসাতে হবে পানীয় জলের জন্যে। সরাই খুলতে হবে, সত্র খুলতে হবে, পুষ্টিকর খাদ্যের জন্যে। ধর্মশালা বা মণ্ডপ তৈরি করাতে হবে গাছতলার চেয়ে নির্ভরযোগ্য আশ্রয়ের জন্যে। কয়েক মাইল অন্তর হাসপাতাল রাখতে হবে চিকিৎসার জন্যে।

এসব হলো মিনিমাম। এর কমে কোনো সভ্য জাতির চলে না। এ ধরণের আয়োজন একদা এদেশে ছিল। যা দু'হাজার বছর আগে ছিল তা আজ নেই। এর থেকে

প্রমাণ হয় না যে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের চেয়ে সভ্য। সভ্যতা কেবল জনকয়েকের ঊর্ধ্ব গতি নয়, জনসাধারণের জীবনযাত্রার একটা মিনিমাম আদর্শ। তার নীচে নামলে সভ্যতার কোনো মানে হয় না। ভারতের দু'একটি প্রদেশ আফ্রিকার মতো ছায়াচ্ছন্ন। অন্যান্য প্রদেশেও এমন অঞ্চল আছে যেখানে মানুষ এক বেলা খায়, ঘর ছাউনির খড় জোটাতে পারে না, সপরিবারে একখানি ঘরে রাত কাটায়, শীতে হি হি করে কাঁপে ও ধুনী জ্বালিয়ে যতটা পারে গরম হয়। বৃষ্টিতে ঘর ভেসে যায়, স্যাঁতস্যাঁতে মেজের উপর ঘুমোয়, মশারি নেই, মশায় কামড়ে ম্যালেরিয়া হলে নাচার। এদের জন্যে প্রাসাদ গড়তে বলছিনে। কিন্তু ইটের মেজের উপর পুরু মাটির দেয়াল ও খাপরা বা টালি বা তক্তা বা টিন বা খড়ের শক্ত চাল চাই। একখানার জায়গায় চারখানা ঘর চাই। কিছু আসবাব, অন্তত কয়েকটা মশারি চাই। কিছু বাসন, অন্তত কয়েকটা ঘটিবাটি চাই। অবশ্য পাতায় খাওয়া একটা মহান আদর্শ, কিন্তু আমাদের মিনিমাম অত নীচে নামবে না। আমরা জাতকে জাত থালায় খাব। এবং সে থালা ঠুনকো এলুমিনিয়মের নয়। অন্তত কাঁসার।

দীনতম দিনমজুরেরও চারখানা ঘর থাকবে, এক সেট বাসনকোশন থাকবে, এক সেট আসবাব থাকবে। আর থাকবে বাগানের জন্যে খানিকটে জমি, সেখানে সে সপরিবারে তরিতরকারি ফলাবে, সম্ভব হলে কিছু শস্য। তার নিজের

গোরু মোষ থাকবে, অন্তত একটা গাই। সম্ভব হলে, ছাগল মুরগী।

এসব সম্ভব হবে না যদি গোচারণের জমি না থাকে এবং যদি সে জমিতে ঘাস না থাকে। এ ভার নিতে হবে রাষ্ট্রকে অথবা রাষ্ট্রের নির্দেশে গ্রাম্যপঞ্চায়ৎকে। গ্রামে যদিও পতিত জমির অভাব নেই তবু সে-সব জমিতে গোরুর পেট ভরে না, সে যায় ক্ষেতে বাগানে পেট ভরাতে, মার খেয়ে খোঁয়াড়ে পড়ে। মানুষের জন্যে যেমন সরাই ও সত্রের কথা বলেছি তেমনি গোরুর জন্যে গোচারণের মাঠ ও মাঠভরা ঘাস নিত্য মজুত থাকবে।

গোচারণের জমি হবে সর্বসাধারণের সম্পত্তি। তেমনি অধিকাংশ দীঘি পুকুর সর্বসাধারণের নির্বাচিত গ্রাম্য পঞ্চায়েতের হাতে তুলে দিতে হবে। যাদের পুকুর তারা যদি যত্ন নিত তা হলে আমি এ প্রস্তাব করতুম না, বরং বলতুম নতুন করে পুকুর কাটা হোক সর্বসাধারণের জন্যে। কিন্তু যেখানে বসে লিখেছি সেখানে ডোবা পুকুর দীঘি সায়র অজস্র। কিন্তু যত্ন নেয় না কেউ। এসব যদি সর্বসাধারণের তরফ থেকে খরিদ করা যায় তা হলে মালিকদের আপত্তি করা সাজে না। তারা অবশ্য দাম পাবে। দাম কিন্তু একদিনে দেওয়া হবে না, বছর বছর কিস্তিতে কিস্তিতে দেওয়া হবে।

অরণ্যের কথা আগে বলেছি। অরণ্যও হবে সর্বসাধারণের

সম্পত্তি, তার রক্ষণাবেক্ষণ পঞ্চায়তের হাতে। সেখানে যদি বন্য প্রাণী বাস করে তবে শিকার করার অধিকার সকলের কিম্বা পঞ্চায়েৎ যাকে ছাড়পত্র দেবে তার। লকৃড়ি কাটার অধিকারও সকলের, কিন্তু পঞ্চায়তের কাছ থেকে ছাড়পত্র নিতে হবে।

অরণ্যের সঙ্গে বৃষ্টির সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। আমাদের দেশের সব চেয়ে প্রাচীন সমস্যা বোধ হয় অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি। এখন থেকে ভাবতে হবে কী করে বৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। বৃষ্টি যদি না হয় তা হলে জলসেচের ব্যবস্থা নিখুঁত হওয়া চাই, নইলে উৎপাদনে ঘাটতি পড়বে, আমাদের প্রত্যেকের রেশন কমবে। জলসেচের ব্যবস্থা যেমন নিখুঁত হবে তেমনি নিখুঁত হবে জলনিকাশের ব্যবস্থা। কারণ অতিবৃষ্টি তো মাঝে মাঝে হয়, জলপ্লাবনে ফসল ডুবে যায়। উৎপাদনে ঘাটতি পড়ে। জলসেচ ও জলনিকাশ এ দুটি প্রশ্নের উত্তর ঠিক মতো না দিতে জানলে আমাদের রেশন নিয়ে টানাটানি, সুতরাং প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি ।

তা ছাড়া জলনিকাশ যদি উচিত মতো না হয় মশা মাছিতে দেশ ছেয়ে যায়, মশা ও মাছি যেসব রোগের বাহন সেসব রোগে মানুষ ভোগে ও মরে। জলনিকাশ বলতে শুধু বৃষ্টির জল নয়, নিত্য ব্যবহার্য জলও বোঝায়। আমাদের অনেক শহরে জলনিকাশের ব্যবস্থা বীভৎস। বড় বড় পাকা বাড়ী, তার আশে পাশে পঙ্কিল নর্দমা, তাতে মলমূত্র গেঁজে উঠেছে ও গন্ধ ছাড়ছে, যারা বাড়ীতে বাস করে তাদের

কেবল চিঠি লেখাই সার, মিউনিসিপ্যালিটি হয় নিষ্ক্রিয় নয় নিরুপায়। এসবের পরিবর্তন বা প্রতিকার না হলে আকাশে কেল্লা গড়া ব্যর্থ হবে। শহর ও গ্রামগুলোর জলনিকাশ ও মলনিকাশ অশন বসন ও আশ্রয়েরই মতো জরুরি।

এই ভাঙা দেশকে ভালো করে ভেঙে গড়তে হলে কোটি কোটি মানুষকে পেটে ভাতে খাটতে হবে, যাকে বলে বেগার দেওয়া। আধুনিক পরিভাষায় কন্‌সক্রিপশন (conscription)। দু' রকম কন্‌সক্রিপশন আছে। সিভিল ও মিলিটারী। গণজাগরণের অর্থই হলো কোটি কোটি স্ত্রীপুরুষ নতুন করে বাঁচার জন্যে স্বেচ্ছায় কন্‌সক্রিপশনের লাঞ্ছনা সইবে। দরকার হলে লক্ষ লক্ষ পুরুষ ভারতের সীমান্তগুলিতে স্বেচ্ছায় মোতায়েন হবে শত্রুকে রুখতে, বেতন নেবে না, নেবে পেটের ভাত, পরণের কাপড়। কোটি কোটি পুরুষ চাষ করবে লাভের জন্যে নয়, নবজীবনের জন্যে। টাকা নেবে না, নেবে পেটের ভাত, পরণের কাপড়। কোটি কোটি নারী চরকা কাটবে লাভের জন্যে নয়, নবজীবনের জন্যে। লক্ষ লক্ষ শিক্ষক ডাক্তার ধাত্রী নার্স এগিয়ে আসবে বেগার দিতে, নামমাত্র পারিশ্রমিক নিয়ে।

দীর্ঘকাল ত্যাগের তপস্যা করতে হবে চল্লিশ কোটিকে। তার পরে আসবে ভোগের সময়। অতিভোগের নয়, অনর্জিত ভোগের নয়, অর্জিত ও পরিমিত ভোগের নূতন জীবন।

(১৯৪৪)

স্বাধীনতা দিবসের চিন্তা

আজ আমাদের স্বাধীনতা দিবস। প্রথমেই প্রণাম করি পুরুষোত্তম গান্ধীকে যাঁর তপস্যা না হলে এই অসাধ্য সাধন সম্ভবপর হতো না। তাঁর মতো যাঁরা তপস্যা করেছেন ত্যাগ করেছেন প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের সকলকেই নমস্কার করি।

এই দিনটি আমার কাছে চরম জয়ের তথা পরম পরাজয়ের দিন। উর্বশী যেমন "উঠেছিল মন্থিত সাগরে ডানহাতে সুধাপাত্র বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে" এই দিনটিও তেমনি উদয় হলো একসঙ্গে জয়োল্লাস ও পরাভববেদনা নিয়ে। একে ফিরিয়ে দিতে গেলে স্বাধীনতাকেও ফিরিয়ে দিতে হতো। দিয়ে লাভ কী হতো? সত্যি কি আমরা আরো কিছুদিন সবুর করলে এ ছাড়া অন্য কোনো রকম স্বাধীনতা পেতে পারতুম যাতে শুধু অমৃত থাকত, গরল থাকত না? দশ বছর অপেক্ষা করলেও কি দেশবিভাগ এড়ানো যেতে পারত? না, যতই ভাবি ততই উপলব্ধি করি, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ পাঁচ দশ বছরে এতদূর শক্তিশালী হতো না যে অবিভক্ত ভারতে ব্রিটেনের একমাত্র উত্তরাধিকারী হতে পারত। কিম্বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও তার মিত্র মুসলিম সম্প্রদায়বাদ এত দূর হীনবল হতো না যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের হাতে একচ্ছত্র রাজত্ব সঁপে দিয়ে নির্বিবাদে

ইতিহাসের মঞ্চ থেকে প্রস্থান করত। আপস করতেই হতো একদিন না একদিন, এক শর্তে না এক শর্তে। হয়তো দেশ বিভক্ত হতো না, কিন্তু প্রত্যেকটি মন্ত্রীমণ্ডল বিভক্ত হতো। আপস করব না বললেই যে নিজের শক্তি পরের শক্তিকে পরাস্ত করত তা নয়। তার জন্যে গৃহযুদ্ধের ভিতর দিয়ে যেতে হতো। ব্রিটেনের বল না কমলে, মুসলিম সম্প্রদায়বাদের বল না কমলে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বল না বাড়লে এক পক্ষ অপর পক্ষের উপর ষোল আনা জয়ী হতে পারত না। চার আনা পরাজয় মেনে নিতেই হতো। গৃহযুদ্ধের পরেও।

ভারতের চার আনা সমর্পণ করে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ অবশিষ্ট বারো আনায় একচ্ছত্র হয়েছে। এও বড় কম নয়। যে অঞ্চল সমর্পণ করা হয়েছে তার মুসলমান অধিবাসীদের ধারণা তারাও স্বাধীন। ইংরেজের সঙ্গে লড়াই না করেই স্বাধীন। তাদের আনন্দে আমরা আনন্দ বোধ করি। ধীরে ধীরে তারা হৃদয়ঙ্গম করবে যে তাদের স্বাধীনতা সিরাজ-উদ্দৌল্লার স্বাধীনতা নয়, মীরজাফরের স্বাধীনতা। পলাশীর যুদ্ধের পাল্টা যুদ্ধে জয়লাভ নয়, পলাশীরই রকমফের। পরে যখন তাদের চৈতন্য হবে তখন তারা পাকিস্তান থেকে ক্লাইভের বংশধরদের হটাবে। আপাতত হটিয়েছে হিন্দুদের। ক্রমে তাদের প্রতীতি হবে যে সব হিন্দুই শোষক নয়। যারা পাকিস্তানের অর্থ পাকিস্তানেই ব্যয় করবে, পাকিস্তানের

শিল্পবাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করবে, বহু লোকের অন্ন জোগাবে তাদের জন্যে পাকিস্তানের দ্বার খোলা। আর যারা নিঃস্ব চাষী মজুর শ্রেণীর খেটে খাওয়া লোক তাদের প্রতি বিদ্বেষ তো আন্তরিক নয়। সেটা উপরের প্ররোচনায়। সে বিদ্বেষ ক্ষয়ে আসছে। আর কয়েক বছর পরে তার চিহ্ন থাকবে না।

এই পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ভারতীয় জাতীয়তাবাদ যাকে বলা হয় তার সঙ্গে হিন্দু পুনরুত্থানবাদ মেশানো ছিল, খাদ্যের সঙ্গে যেমন ভেজাল। মুসলিম পুনরুত্থানবাদের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে হিন্দু পুনরুত্থানবাদ কোনো দিনই ষোলো আনা জয়ী হতো না। সে শক্তি তার ছিল না, নেই, হবেও না। ইতিহাস যাকে হাজার বছর আগে মেরে রেখেছে সেই ভূত যদি বেঁচে ওঠে তা হলে দেখবে ইতিহাস যাকে দু'শো বছর আগে মেরে রেখেছে সে ভূত তার চেয়েও জ্যান্ত। ভূতের সঙ্গে তলে তলে হাত মিলিয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ আপনাকে তার দুর্বলতার শরিক করেছে। যারা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতি বিশ্বাসপরায়ণ তারা একই শিবিরে হিন্দু পুনরুত্থানবাদকে আনাগোনা করতে দেখে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারেনি। যে দোকানে বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত বিক্রি হয় তার পাশের দোকানে বনস্পতি বিক্রি হতে দেখলে সহজেই সন্দেহ হয়। তারপরে যদি দেখা যায় দুই দোকানের

মাঝখানে চোরা দরজা দিয়ে লোক চলাচল করছে তা হলে সন্দেহ দাঁড়ায় অবিশ্বাসে। অতীত ভারত ফিরে আসবে এই যদি হয় ভাবী ভারতের স্বরূপ তাহলে অতীত ভারতে যারা ছিল না ভাবী ভারতে তাদের স্থান হবে কী করে? নিজেদের জন্যে তারা তো একটা স্থান চাইবেই। সে স্থানটুকু ছেড়ে দিতে হবে ভারতকেই। হিন্দু পুনরুত্থানবাদ পাকিস্তানের জন্যে দায়ী। অবশ্য পুরোপুরি দায়ী নয়। মুসলিম পুনরুত্থানবাদও দায়ী। আরো বেশী দায়ী।

আর এই যে পুনরুত্থানবাদ এ তো উচ্চশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার কৌশল। প্রাচীন ভারত ফিরে এলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যেরই সুবিধা। শূদ্রের দাসত্বের উপর তাদের পিরামিড তৈরি হবে। আর নারীর দাসীত্বের উপর। মধ্যযুগের ভারত ফিরে এলে ফিউডাল সমাজব্যবস্থা কায়েম হবে। জমিদার জোতদারের সুখস্বর্গ। ভূমিহীন চাষী ও দিনমজুরের নরকযন্ত্রণা। রায়তের বেগার খাটা। এসব বাদ দিয়ে হিন্দু গৌরব বা মুসলিম গৌরবের পুনরুদ্ধার করতে গেলে তা সম্ভব হবে কোন মন্ত্রবলে! এই পাঁচ বছরে এই দুই ভূত আমাদের ঘাড় থেকে নেমেছে, তবে এখনও ঘর থেকে বিদায় হয়নি। ক্ষতি যা করেছে তা সাংঘাতিক। কেবল দেশ ভেঙে দেওয়া নয়, বুক ভেঙে দেওয়া, মন ভেঙে দেওয়া। গান্ধীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও ঘাতকের প্রতি সহানুভূতি লক্ষ্য করে আমার মন ভেঙে গেছে। তবে গোড়্‌সে যে

ভারতের চিত্ত জয় করতে পারবে না এটা ধ্রুব সত্য। গোড়্‌সেপন্থীরাও পারবে না। এরা একদিন নির্মূল হবেই। আর পাঁচ বছর পরে দেখা যাবে এরা নির্বাচনে কল্‌কে পাবে না। সমাজ থেকেও এদের হটাতে হবে, শুধু রাজনীতি থেকে নয়। এক্ষেত্রে কোনো আপস নেই। ঘৃতের সঙ্গে বনস্পতির আপস ঘৃতের পক্ষে মারাত্মক। এরা যেদিন সমাজ থেকে হটবে সেদিন মুসলমানের বিশ্বাস হবে যে সে ম্লেচ্ছ বা অন্ত্যজ নয়, সে একই সমাজের ভিন্নধর্মী নাগরিক হোক। তারপরে পাকিস্তান থাক্‌তে পারে, কিন্তু তার থাকা হবে অর্থহীন। তত দিন তার অস্তিত্বের অর্থ আছে। অকারণে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়নি। কেবল যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও মুসলিম সম্প্রদায়বাদের চালবাজি দেখি তা হলে স্থূলদৃষ্টির পরিচয় দেব। আছে গভীরতর অর্থ। ঘরে-বাইরে মুসলমানকে "দূর দূর" করব, অথচ মুসলমান-প্রধান অঞ্চলকে ভারতের আঁচলে বাঁধব দুই একসঙ্গে হয় না। হয় না বলেই পাকিস্তানের উদ্‌ভব ও স্থিতি। যতদিন না এই "দূর দূর" নীতি সমাজ থেকে রাষ্ট্র থেকে যাচ্ছে ততদিন অবিভক্ত ভারতের সম্ভাবনা নেই। পাকিস্তান তো আসবেই না, পণ্ডিচেরী গোয়া প্রভৃতি খ্রীস্টান অধিকৃত অঞ্চলও আসবার নয়। এবং কাশ্মীর নিয়ে মাথাব্যথাও সারবে না।

এই স্বাধীনতা নিয়েই আমাদের কাজ করে যেতে

হবে। এই অমৃতগরল নিয়ে। এই জয়পরাজয় নিয়ে। বিরাট সামাজিক পরিবর্তন চাই, এই যদি হয় আমাদের লক্ষ্য তবে এই লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে শিল্পীকরণের পথ দিয়ে যেতে হবে। নইলে শুধু সদিচ্ছার দ্বারা জাতিভেদ যাবে না, নারীর দাসীত্ব শূদ্রের দাসত্ব যাবে না। অন্যায়ের স্থায়িত্বের পক্ষে যে অবস্থা অনুকূল তাকে প্রশ্রয় না দিয়ে যে অবস্থা প্রতিকূল তাকেই প্রাধান্য দিতে হবে। আপাতত বিকেন্দ্রীকরণ নয়। বিকেন্দ্রীকরণের সময় আসবে যখন এই সব পচা প্রাচীন প্রথা বিনষ্ট হবে তখন। নইলে আবার এরা মাথা তুলবে। তবে বিকেন্দ্রীকরণের জন্যে যাঁরা তপস্যা করছেন তাঁদের তপস্যায় ছেদ পড়লে চলবে না। তাঁরা একমনে কাজ করে যেতে থাকুন।

(১৯৫২)

সেক্যুলার স্টেট

সেক্যুলার স্টেট-এর বাংলা কী?

যে দু'একজন মন্ত্রী সরকারী নথিপত্রে বাংলাভাষা ব্যবহার করে থাকেন তাঁদের একজনকে লিখতে দেখা গেল, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। মুগ্ধ হলুম তাঁর ভাষাপ্রেম লক্ষ্য করে। নিজে কিন্তু ইংরেজীতে লিখলুম, সেক্যুলার স্টেট।

কেন? ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কী দোষ করল? অন্তত লৌকিক রাষ্ট্র তো খবরের কাগজের দৌলতে বাজার-চলতি হয়ে গেছে। এর কোনোটা পছন্দ না হলে হাতের কাছে টেলিফোন তো ছিল, রাজশেখর বসু মহাশয়কে টেলিফোনে স্মরণ করলে খাপসই একটা পারিভাষিক শব্দ পেতে কতক্ষণ লাগত? সংস্কৃত ভাষার অন্তহীন ধ্বনিভাণ্ডারে শব্দের অভাব কবে ঘটল?

চেষ্টা করলে যে কোনো বিদেশী শব্দকে স্বদেশী ভাষায় অন্তরিত করা যায়। কিন্তু শব্দ যেখানে আসল নয়, অর্থ যেখানে আসল, আইডিয়া যেখানে আসল সে সব জায়গায় বিদেশীর বদলে স্বদেশী ব্যবহার করলে ভাষান্তরের সঙ্গে সঙ্গে ভাবান্তর ঘটা বিচিত্র নয়। বিশেষত শব্দের পিছনে যদি বহু শতকের সংগ্রামের বা সংঘাতের ইতিহাস থাকে তবে তো প্রতিশব্দের মধ্যে সেই ঘাত প্রতিঘাতের আভাসটুকুও মেলে না।

সেইজন্যে আমি সেক্যুলায়ের বাংলা ধর্মনিরপেক্ষ বা লৌকিক লিখতে রাজী নই। তা ছাড়া আরো কারণ আছে। খোদ সেক্যুলার কথাটি আমাদের কাছে নতুন। পাঁচ বছর আগে জবাহরলাল একদিন সেটি ব্যবহার করলেন। দেশ বিভাগের পূর্বাহ্নে। দেশ বিভাগের পরে গান্ধীজীকে সেটি ব্যবহার করতে দেখা গেল। এতদিন আমরা শুনে আসছিলুম যে স্বরাজ বলতে বোঝাবে রামরাজ্য। শুনলুম রামরাজ্য নয়, সেক্যুলাব ডেমোক্রেসী বা সেক্যুলার স্টেট। রামবাজ্যের পাল্টা রহিমবাজ্যের চেহাবা দেখে আমাদের নেতাদের তাক লেগে যায়। কে জানে রামরাজ্য হয়তো দু'দিন পরে হনুমদ্‌রাজ্যে পরিণত হতো। তাই রাতারাতি সেক্যুলার বিশেষণটি উড়ে এসে জুড়ে বসল। অভিধানে এর সঙ্গে আমাদের মুখ চেনা ছিল। কিন্তু জীবনে পরিচয় ছিল না। এই নবাগতের সঙ্গে আমাদের কিসের প্রয়োজন তাও আমাদের কাছে পরিষ্কার হয় নি। এর তাৎপর্য নিয়ে যখন তর্ক উঠল তখন এক একজন এক এক রকম ব্যাখ্যা দিলেন। গান্ধীজী তখন নেই। তাঁর এক বিশিষ্ট অনুচর নিজস্ব অভিমত জানিয়ে বললেন, ইংরেজীতে সেক্যুলার শব্দের অর্থ যাই হোক না কেন আমরা তো ও শব্দ অন্য অর্থে ব্যবহার করতে পারি।

এইখানেই বিপদ। ইংরেজীতে ডেমোক্রেসী শব্দের অর্থ যাই হোক না কেন স্টালিন তা অন্য অর্থে ব্যবহার

করছেন। মাও চে তুং করছেন অন্য অর্থে। তেমনি আমাদের সম্পাদক ও রাজনীতিকরা যদি সেক্যুলার শব্দের অন্য অর্থ করেন তা হলে আশ্চর্য হব না। কিন্তু শঙ্কিত হব। কারণ সেক্যুলার শব্দটি খামোকা আসে নি। ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে এর প্রবেশ যদিও অকস্মাৎ তবু আকস্মিক নয়। হিন্দু মুসলমানের মাথা কাটাকাটি কি কেবল দেশ বিভাগের দ্বারা এড়াতে পারা যায়? এর স্থায়ী সমাধান হচ্ছে সেক্যুলার মনোভাব। যে মনোভাব ইউরোপে এসেছে বহু শতকের রক্তাক্ত সংঘর্ষের ফলে। যার অন্য অর্থ নেই।

কিন্তু কী এর প্রকৃত অর্থ?

এর উত্তর দিতে হলে দু'তিন হাজার বছরের ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে হয়। প্রথমত পশ্চিম ইউরোপের ইতিহাস মায় আমেরিকার ইতিহাস। দ্বিতীয়ত ভারতবর্ষের ইতিহাস।

পশ্চিম ইউরোপের লোক যখন খ্রীস্ট ধর্ম গ্রহণ করে তখন ধর্মগুরু ও ধর্মসংঘের প্রতি তাদের সকলের আনুগত্য দেখে খ্রীস্টেনডম বা খ্রীস্টরাজ্য নামক ধারণাটি মানুষের মনে বসে যায়। রাজা একাধিক, কিন্তু পোপ এক। রাষ্ট্র একাধিক, কিন্তু চার্চ এক। প্রত্যেক দেশেই পোপের অধীনস্থ ধর্মযাজকের দল একজোট হয়ে কাজ করে যায়, এক দেশ থেকে আরেক দেশে বদলি হয়, ল্যাটিন ভাষায় উপাসনা করে, ল্যাটিন ভাষায় নাম রাখে। চার্চের তুলনায়

রাষ্ট্র অনেকটা ক্ষীণবল, রাজা অনেক সময় চার্চের হাতের পুতুল। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে চার্চ তার নিজের আদালত বসায়, বিচার করে, দণ্ড দেয়, আগুনে পোড়ায়, খাজনা আদায় করে। এমন এক সময় আসে যখন দেখা যায় পোপের হাতে কেবল নৈতিক বা সামাজিক ক্ষমতা নয়, রাজনৈতিক বা সামরিক ক্ষমতাও এসে পড়েছে। কেউ যদি বিধর্মী হয় তাকে তিনি কেবল সমাজচ্যুত করে ক্ষান্ত হবেন না, ধনে-প্রাণে ধ্বংস করবেন। পৃথিবীর চার দিকে সূর্য ঘুবছে কেউ যদি এই তত্ত্ব অস্বীকার করে বলে সূর্যের চার দিকে পৃথিবী ঘুরছে তা হলে আর রক্ষা নেই। অমনি বিধর্মী হয়ে গেল। চিন্তার স্বাধীনতা, বাক্যের স্বাধীনতা, কর্মের স্বাধীনতা, সব কিছু ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এবং ধর্ম বলতে বোঝায় ধর্মগুরু ও ধর্মসংঘ। এবং তাঁদের হাতে ইহলোকের পরলোকের সব রকম যন্ত্রণাব যন্ত্র।

হাজার বছর ধরে এই অদ্ভুত এক্সপেরিমেন্ট চলল। এর ভালো দিক যে ছিল না তা নয়। মধ্যযুগের অসভ্যতার অন্ধকারে সভ্যতার দীপ জ্বালিয়ে রেখেছিল চার্চ, 'যদিও তাতে অন্ধকার যায় নি। বহুচারী ক্ষত্রিয়দের এক-বিবাহে বাধ্য করাও সামান্য কীর্তি নয়। প্রায় দু'হাজার বছর আগে রোমান চার্চ যা পেরেছে প্রায় দু'হাজার বছর পরেও দিল্লীর কংগ্রেস সরকার তা পারছেন না। হিন্দু রাজ,

মোগল রাজ, ব্রিটিশ রাজও পারেন নি। করাচীর নয়া মুসলিম রাজ তো তার কাছ দিয়েও যাচ্ছেন না। কাজেই রোমান চার্চের কৃতিত্বের প্রশংসা করতেই হয়। তা সত্ত্বেও পশ্চিম ইউরোপের অর্ধেক দেশ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে সামাজিক মানসিক বাচনিক স্বাধীনতার অভাবে। রেনেসাঁস তাদের চোখ ফুটিয়ে দেয়। রেনেসাঁসের ন্যায়সঙ্গত পরিণতি রেফর্মেশন। পোপের বিরুদ্ধে, রোমান চার্চের বিরুদ্ধে, ল্যাটিনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। পোপের রাজকীয় ক্ষমতাই তাঁর কাল হলো। গুরু মহারাজ যদি সত্যিকারের মহারাজ হয়ে ওঠেন তা হলে সত্যিকারের মহারাজের দল কি তা সহ্য করতে পারেন? ইংলণ্ডের অষ্টম হেনরী যে প্রজাবন্ধু ছিলেন তা নয়। ব্যক্তিগত স্বার্থেই তিনি পোপের শত্রু হন। তাঁর প্রজারা তবু তাঁকে সমর্থন করে। ইংলণ্ডের খ্রীস্টানরা দেখতে দেখতে প্রোটেস্টাণ্ট হয়ে যায়। ক্যাথলিকরা হয়ে দাঁড়ায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। অবাক কাণ্ড। কেবল ইংলণ্ড নয়, জার্মানী হল্যাণ্ড নরওয়ে সুইডেন ইত্যাদি বহু দেশ পোপের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। নিজেদের এক একটা চার্চ খাড়া করে। সেখানেও শেষ নয়। সরকারী চার্চ প্রায় রোমান চার্চের মতো হস্তক্ষেপকারী বলে সরকারী চার্চ থেকেও বহু লোক নাম কাটিয়ে নেয়। তাদের ছোট ছোট সম্প্রদায় না মানে গুরু মহারাজকে না মানে রাজা মহারাজকে—অবশ্য ধর্মের ক্ষেত্রে।

এসব এক দিনে হয়নি, বিনা দ্বন্দ্বেও হয়নি। ঘোরতর মারামারি কাটাকাটি ত্রিশ চল্লিশ বছর ধরে চলে। আমরা আর কতটুকু রক্তারক্তি করেছি। মানুষের মাংস তো আর খাইনি। জার্মানরা নাকি তাও করে দেখেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই স্থির হলো যে ইংলণ্ডের মতো দেশে পোপের চেয়ে রাজা বড়, রাজার চেয়ে প্রজা বড়। প্রথম চার্লসের মাথা কেটে ও দ্বিতীয় জেমসকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে ইংলণ্ডের লোক কেবল পোপকে নয় রাজাকেও সমঝিয়ে দেয় যে সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই। প্রজাপ্রভাবিত রাষ্ট্রই হলো চার্চের চেয়ে বড়। প্রজাদের রাষ্ট্র ধীরে ধীরে অলক্ষিতে সেক্যুলার স্টেট হয়ে ওঠে। এক শতক পরে যখন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তার মূলনীতি হয় সেক্যুলারিজম। তার কিছুদিন পরে যখন ফরাসী বিপ্লব ঘটে তখন সেক্যুলারিজমের জয়জয়কার। ইংলণ্ডে যা প্রচ্ছন্ন ছিল ফ্রান্সে তা প্রকট হলো। প্রজারা যদি নাস্তিক হয়, ধর্ম বলে কিছু না মানে তা হলেও তারা রাজ্যের অধিকারী। রাষ্ট্র তাদের চিন্তায় বাক্যে ও আইনসঙ্গত কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করবে না। চার্চ থাকতে পারে, কিন্তু কোনো রকম পৃষ্ঠপোষকতা দাবী করবে না, বিশেষ অধিকার প্রত্যাশা করবে না। প্রজাদের কার কী ধর্ম, আদৌ কোনো ধর্ম আছে কি না, এ প্রশ্ন উঠবে না। ধরে নিতে হবে যে ধর্ম তাদের ঘরোয়া ব্যাপার। পাবলিক নয়, প্রাইভেট ব্যাপার।

যার কোনো ধর্ম নেই সেও সরকারী চাকরি করতে পারে, সেনাপতি হতে পারে, সেও নির্বাচনে দাঁড়াতে পারে, প্রেসিডেন্ট হতে পারে, সেও দেশ শাসন করতে পারে, প্রধান মন্ত্রী হতে পারে।

ফরাসী বিপ্লবের পর আবো এক শতক লাগল এ নীতি বলবৎ করতে। ফরাসীদের দেশে ড্রেফু নামে এক ইহুদী মিলিটারি অফিসার ছিলেন, তাঁর একমাত্র অপরাধ তিনি ইহুদী। ঐ অপবাধে তাঁকে সৈন্যবিভাগ থেকে বিদায় করা যায় না। মিথ্যা মামলা সাজানো হলো, তাও প্রকাশ্য আদালতে দায়ের করার মতো সৎসাহস ছিল না, সামরিক আদালতের বিচাবে বা অবিচারে ড্রেফুর হয়ে গেল দ্বীপান্তর। দুনিয়ার লোক জানলো বিশ্বাসঘাতকের উপযুক্ত দণ্ড হয়েছে। কিন্তু ফ্রান্সের যাঁরা বিবেকী ব্যক্তি তাঁরা ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারলেন নিরপরাধের সাজা হলে কেউ নিরাপদ নয়, নিরপরাধ এক্ষেত্রে ধর্মভেদের জন্যে দণ্ডিত, সুতরাং সেক্যুলার স্টেট বিপন্ন। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক এমিল জোলা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবে অপরিচিত এক ইহুদী অফিসারের পক্ষ নিয়ে বিশ্বের জনমতেব সামনে নিজের দেশের রাষ্ট্রনায়কদেরই অভিযুক্ত করলেন, তখন রাগের চোট পড়ল জোলার উপরে। জোলার আত্মত্যাগ ব্যর্থ গেল না। শিক্ষিত ফরাসী মাত্রেই চঞ্চল হয়ে উঠলেন। যেন একটি মানুষের প্রতি সুবিচার অবিচারের উপর একটি জাতির সুনাম দুর্নাম নির্ভর করছে। বারো

বছর ধরে অবিরাম আন্দোলন চলে। ড্রেফুকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করা হয়।

ড্রেফু যদি ইহুদী না হয়ে ক্যাথলিক হয়ে থাকতেন তা হলে ব্যাপার এত দূর গড়াত না। বিপ্লবের দেশ ফ্রান্স, সেখানেও মানুষের ধর্মসম্প্রদায় বিচার করে মামলার বিচার হয়। এই বারো বছরে ফ্রান্স তার আত্মাকে আবিষ্কার করল। ফ্রান্সের দৃষ্টান্ত অন্যান্য দেশের উপর প্রভাব বিস্তার করল। সেক্যুলার স্টেট এই অগ্নিপরীক্ষায় সীতার মতো উত্তীর্ণ হলো। পশ্চিম ইউরোপে ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ এ দিক দিয়ে জয়ী হয়েছে। রুশ বিপ্লবের পর রুশপরিচালিত সোভিয়েট ইউনিয়নেও। আমেরিকার তো কথাই নেই। ফরাসী বিপ্লবের আগে আমেরিকার স্বাধীনতা, গোড়া থেকেই সেখানে সেক্যুলার স্টেট। নিছক ধর্মবিশ্বাসের দরুন সেখানকার কোনো প্রজা রাষ্ট্রের দরবারে ছোট বা বড় নয়, ধর্মাধিকরণে তো নয়ই। কে ক্যাথলিক, কে প্রোটেস্টাণ্ট, কে ইহুদী এসব বাছবিচার ঘরে চলতে পারে, বাইরে চলে না। বর্ণ বিদ্বেষ অবশ্য আছে, কিন্তু সেটা অপ্রাসঙ্গিক।

২

এবার ভারতবর্ষের ইতিহাস। পশ্চিম ইউরোপে যেমন এককালে একটিমাত্র ধর্ম ছিল, একজনমাত্র ধর্মগুরু ছিলেন, একটিমাত্র ধর্মসংঘ ছিল এ দেশে তেমন নয়। কোনো

কালেই নয়। সাধারণত যাকে হিন্দুধর্ম বলা হয়ে থাকে তা একাধিক ধর্মের সমবায় বা সমন্বয় সেই আদি যুগ থেকে। হিন্দু পোপ বা হিন্দু চার্চ কোনো দিন কেউ কল্পনাও করেনি, তবে হিণ্ডুডম বলে একটা ধার করা বুলি কিছু দিন আগে শোনা যাচ্ছিল বটে।

ইসলামেও পোপের অনুরূপ বা চার্চের অনুরূপ নেই, তবে খলিফা বলে একজন ছিলেন, কিন্তু ভারতের সুলতান ও বাদশাহদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এত কম ছিল যে সংঘর্ষের উপলক্ষ কোনো দিন ঘটেনি।

পোপ বা চার্চ না থাকলেও আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ শ্রমণ উলেমা ছিলেন। এঁদের প্রভাব কেবল আধ্যাত্মিক বা পারলৌকিক ব্যাপারে নিবদ্ধ ছিল না, জীবনের প্রত্যেকটি ব্যাপারে প্রসারিত ছিল। এমন কোনো হিন্দু রাজার নাম জানিনে যিনি ব্রাহ্মণপ্রাধান্য অস্বীকার করেছিলেন, এমন কোনো বৌদ্ধ নরপতির নাম জানা নেই যিনি শ্রমণ প্রাধান্য উপেক্ষা করতে পেরেছিলেন, আকবরই বোধহয় একমাত্র মুসলমান সম্রাট যিনি উলেমা প্রাধান্য কাটিয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজেই একটা নতুন ধর্ম প্রবর্তন করে পোপ হয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন। এর নাম সেক্যুলার স্টেট নয়।

অপর পক্ষে আমাদের রাজা রাজড়াদের সংযত করাও আমাদের ব্রাহ্মণ শ্রমণ উলেমাদের সাধ্যের অতীত ছিল।

তাঁরা যা খুশি করতে পারতেন, যাকে খুশি হত্যা করতে পারতেন, যতটা খুশি বিয়ে করতে পারতেন। তাঁদের স্বেচ্ছাচারিতা ছিল অবাধ অপ্রতিহত। পোপ বা চার্চ থাকতে পশ্চিম ইউরোপে এই পরিমাণ স্বেচ্ছাচারিতা সহজ ছিল না। এ দেশের প্রজাশক্তিও রাজশক্তিকে নিয়মন করতে জানত না। ভারতের প্রজাশক্তি এই সম্প্রতি রাজশক্তির সঙ্গে লড়াই করে জিতেছে।

বস্তুত সেক্যুলার স্টেট-এর আদর্শ রাজতন্ত্রী আদর্শ নয়, ধর্মতন্ত্রী আদর্শ তো নয়ই। এটা ধর্মতন্ত্র ও রাজতন্ত্র উভয়ের পতনের উপর বা নিয়মনের উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিলে তবেই সেক্যুলার স্টেট-এর প্রশ্ন উঠে। তর্কের খাতিরে উলেমাদের ব্রাহ্মণ ও সুলতানদের ক্ষত্রিয় বলে ধরে নিচ্ছি। ব্রিটিশ আমলের আগে আমাদের দেশে সেক্যুলার স্টেট-এর নামগন্ধ ছিল না। ইংরেজের নিজের দেশে প্রজাশক্তির অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার সেক্যুলার মনোভাব আসে, ইংরেজ এ দেশে তার পত্তন করে। লাটসাহেবদের সঙ্গে এক দল যাজক এসেছিলেন বটে, কিন্তু শাসনের ব্যাপারে তাঁদের সংশ্রব ছিল না। তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে আইন তৈরি বা আইন রদ বদল হতো না। তাঁদের মুখ চেয়ে আদালতের বিচারকার্য হতো না। তাঁদের কথায় কেউ ফাঁসি যায়ও নি, কারো ফাঁসি বন্ধও হয় নি। তাঁদের

ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বা একমাত্র ধর্ম এমন কোনো নীতি তাঁরা ব্রিটিশ শাসকদের দিয়ে চালু করাতে পারেন নি। সব ধর্মের সমান অধিকার এটা ব্রিটিশ শাসনেরই বিশেষত্ব। তার আগে দু' একজন হিন্দু রাজা বা মুসলমান সুলতান ব্যক্তিগত ভাবে এ নীতি অনুসরণ করলেও রাষ্ট্রের দ্বারা এ নীতি ব্যাপক ভাবে অনুসৃত হবার সংবাদ আমি রাখিনে। একই অপরাধের জন্যে শূদ্র ফাঁসি যাচ্ছে বামুন ছাড়া পাচ্ছে বা অল্প সাজা পাচ্ছে এইটেই ছিল নিয়ম। উলেমা বা ফকির হলে তার সাত খুন মাফ। হাঁ, ইংরেজই সর্ব প্রথম এ নিয়ম উল্টে দেয়।

সেক্যুলার স্টেট-এর বনিয়াদ তা হলে দুটি। এক, প্রজাশক্তির অভ্যুদয়। দুই, সব প্রজার সমান অধিকার। প্রজাদের মধ্যে ভেদবুদ্ধি এনে তাদের দুর্বল করা চলবে না। দুঃখের বিষয় ব্রিটিশ আমলের শেষের দিকে সাম্রাজ্য বাঁচানোর জন্যে ইংরেজ এই ভেদনীতির আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু আইনে আদালতে নয়। সেদিক থেকে ব্রিটিশ শাসন বরাবর সেক্যুলার ছিল।

ব্রিটিশ শাসন যখন শেষ হবার মুখে তখন এক দল লোক হাঁক ছেড়ে বলল, আমরা চাই পাকিস্তান, তার মানে ইসলামী রাষ্ট্র। তা শুনে আরেক দল লোক তাল ঠুকে বলল, আমরা চাই হিন্দুস্থান, তার মানে হিন্দু রাষ্ট্র। কোথায় গেল গান্ধীজীর রামরাজ্য! রামরাজ্য যে হিন্দু

রাষ্ট্র নয়, ইংরেজী 'কিংডম অফ গড'-এর ভাষান্তর, কে এ কথা বোঝে, কেই বা বোঝায়! বিদেশী শব্দের স্বদেশী প্রতিশব্দ যে কেমন বিপজ্জনক গান্ধীজীর রামরাজ্যই তার সেরা দৃষ্টান্ত। টলস্টয়ের বই থেকে গান্ধীজী ওটি নিয়েছিলেন। তুলসীদাসের পুঁথি থেকে নয়। কিন্তু যারা টলস্টয় পড়েনি, তুলসীদাস পড়েছে, তারা রামরাজ্য বলতে বুঝবে অযোধ্যার বর্ণাশ্রমী রাজ্য রামচন্দ্রের রাজত্ব। কোথায় কিংডম অফ গড আর কোথায় রামচন্দ্রের রাষ্ট্র!

রামরাজ্যের স্বপ্ন গান্ধীজীর মন থেকে মিলিয়ে গেল হিন্দু মুসলমানের খুনোখুনি দেখে। ভালোই হলো। কিংডম অফ গড প্রতিষ্ঠা করার সাধ মানুষের ইতিহাসে এই প্রথম নয়। খ্রীস্ট ধর্মের আদিপর্বের তাৎপর্য তো কিংডম অফ গড প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। কিংডম অফ গড থেকে এক ধাপ নেমে খ্রীস্টেনডম, তার থেকে এক ধাপ নেমে পোপ সাম্রাজ্য ও মানুষের জ্ঞানবুদ্ধিচিন্তাবাক্য সব স্বাধীনতার দ্বারে অর্গল। হাজার বছর কেউ টুঁ শব্দটি করেনি, পাছে কিংডম অফ গড প্রজাপতির মতো উড়ে পালিয়ে যায়। তার পরে প্রতিবাদের ভাব জাগে। হঠাৎ এক দিনে নয়। ধীরে ধীরে পাঁচশো বছর সময় নিয়ে। পাঁচশো বছর ধোঁয়াতে ধোঁয়াতে অবশেষে জ্বলে ওঠে আগুন। এই অকরুণ অভিজ্ঞতার পর পশ্চিম ইউরোপের লোক আর কিংডম অফ গড-এর স্বপ্ন দেখে না। গত

কয়েক বছরে হিন্দু মুসলমানের পিশাচ মূর্তি দেখে আমাদেরও সে স্বপ্ন ভেঙেছে। ভাঙা স্বপ্ন জোড়া লাগে না। তার বদলে পাওয়া গেল সেক্যুলার স্টেট-এর আদর্শ।

সেক্যুলার স্টেট-এর সূত্রপাত ব্রিটিশ আমলেই হয়েছিল। তবে আমাদের মনের উপর নয়। আমরা ওর মর্ম বুঝিনি, ওকে আপন করে নিইনি। এখন ইতিহাস আমাদের তু'খানা হাত কেটে নিয়ে আমাদের সমঝিয়ে দিয়েছে সেক্যুলার স্টেট কেন মূল্যবান। সবাই সমঝেছে তা নয়। তবু যেটুকু অগ্রগতি হয়েছে সেটুকুর জন্যে কৃতজ্ঞ হতে হয়। পাকিস্তানেও এর ঢেউ পৌঁছেছে। পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলনটা পশ্চিম ইউরোপের ল্যাটিনবিরোধী আন্দোলন ছাড়া আর কী? ঐ ভাবেই রেফর্মেশন সুরু হয়। শেষ যখন হবে তখন দেখা যাবে ইসলামী রাষ্ট্রের দালান ধ্বসে পড়েছে। ভগ্ন স্তূপের নীচে থেকে উঁকি মারছে সেক্যুলার স্টেট-এর বটবৃক্ষ। তুর্কী যে পথে গেছে পাকিস্তানও যাবে সেই পথে।

তা হলে সেক্যুলার স্টেট-এর বাংলা কী? বস্তুটা কী আমি যতদূর বুঝি বোঝাতে চেষ্টা করলুম। নামটা কী হবে তা আপনারাই স্থির করুন। নামকরণের ভার আমার উপর নয়। যাঁদের উপরে তাঁরা যেন অভিধান মন্থন না করে ইতিহাস তল্লাস করেন।

(১৯৫২)

ভূল চিন্তার মাশুল

সম্প্রতি একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ভারতীয় ইতিহাস প্রসঙ্গে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বার বার দু'বার বললেন, "ভারতীয়, তার মানে হিন্দু", "হিন্দু, তার মানে ভারতীয়।"

হিন্দু কথাটির ব্যবহার তিনি প্রচলিত অর্থে করেছিলেন। মুসলমান খ্রীস্টানকে বাদ দিয়ে। সুতরাং "হিন্দু, তার মানে ভারতীয়", "ভারতীয়, তার মানে হিন্দু" বার বার দু'বার এই উক্তি শুনে আমার মনে ধাঁধা লাগল। আমি ছিলুম সভাপতির আসনে। সভাপতিকে কিছু বলতে হয় বলে আমাকে কিছু বলতে হলো। আমি বললুম, "যে ভারতীয় সে হিন্দু, কোনো কোনো স্থলে এ ব্যবহার শুদ্ধ। কিন্তু সব সময় তা নয়। পার্থক্য আছে।"

অধ্যাপক অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হলেন। প্রশ্ন করলেন, "প্রাচীন ভারতেও?"

আমি উত্তর দিলুম, "হ্যাঁ, প্রাচীন ভারতেও। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে আর্যরা যখন ভারতে আসেন তার আগেই বেদ, অন্তত বেদের কতক অংশ, রচনা করা হয়ে গেছল। বেদ হিন্দু শাস্ত্র, কিন্তু ভারতীয় গ্রন্থ কিনা সে বিষয়ে তর্ক উঠতে পারে।"

তার পর আমাকে বাধ্য হয়ে এ কথাও বলতে হলো, "চিন্তায় যদি কোনো ভুল থাকে তার ফলে কর্মেও ভুল ঘটে।

দেশবিভাগের মূলে রয়েছে এই ধরণের অশুদ্ধ চিন্তা। যারা হিন্দু তারাই যদি হয় ভারতীয়, তবে যারা হিন্দু নয় তারা অভারতীয়। তারা যদি অভারতীয় হয়ে থাকে তবে তারা ভারত রাষ্ট্রের বাইরে আলাদা একটা রাষ্ট্র দাবী করবেই, পাবেও। করেছে এবং পেরেছে। কী ভয়ানক মাশুল দিতে হয়েছে এর জন্যে!"

এ কথাও আমাকে বলতে হলো, "কিছু কাল থেকে লক্ষ করে আসছি ভারত ইতিহাসের কোন তারিখে ভারত পরাধীন হলো এ নিয়ে দুই দলের দুই মত। এক দল বলেন, সিরাজউদ্দৌলার পর থেকে পরাধীনতার আরম্ভ। আরেক দল বলেন, পৃথ্বীরাজের পর থেকে পরাধীনতা শুরু। গোটা মুসলিম আমলটাই পরাধীনতার যুগ। এ কথা যদি সত্য হয় তবে আমাদের ষাট বছরব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রাম কেবল ইংরেজের হাত থেকে নয়, মুসলমানের হাত থেকেও মুক্তি পেতে। তা হলে মুসলমানকে ডাকি কেন সংগ্রামে যোগ দিতে, ডাকলেও কেনই বা সে যোগ দেবে? যাঁরা যোগ দিয়েছেন তাঁদের বলেছি পলাশী থেকেই পরাধীনতার সূত্রপাত। অথচ নিজেরা বলাবলি করে আসছি পৃথ্বীরাজের সময় থেকে পতনের সূচনা। শুনলে তাঁদের মনে কষ্ট হবে না?"

এর পরে আরো বিশদ করতে হলো। হিন্দু নামক একটি সমাজ বা সম্প্রদায় ও ভারত নামক একটি দেশ বা নেশন এক জিনিস নয়। পলাশীর পূর্বে ভারত এক দিনের জন্যেও

পরাধীন হয়নি। অন্য কোনো বিদেশী রাষ্ট্র তার রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হরণ করেনি। পৃথিবীর অপরাপর রাষ্ট্র তাকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলেই গণ্য করে এসেছে। এর ব্যত্যয় ঘটে ইংরেজ আমলে। সুতরাং ভারতের পরাধীনতা আটশো বছরের নয়, দু'শো বছরের। ইতিমধ্যে যারা ভারতে রাজত্ব করেছে তারা অহিন্দু হতে পারে, কিন্তু অভারতীয় নয়। হিন্দুর হয়তো খুব দুর্দিন গেছে, কিন্তু ভারতের কী ক্ষতি হয়েছে? তার ধনসম্পদ বিদেশে চলে যায়নি। সে দরিদ্র হয়নি। বাংলা প্রভৃতি প্রাদেশিক সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। বহু সাধু-সন্তের আবির্ভাব ঘটেছে। পৃথিবীর লোক ভারতকে শ্রদ্ধা করে এসেছে। পলাশীর যুদ্ধেই ভারতের প্রথম পরাজয়। তার পূর্বের যে পরাজয় তা ভারতের নয়।

সভাভঙ্গের পরে ঐতিহাসিক আমাকে আড়ালে বললেন, "হাঁ, এইখানেই আপনার সঙ্গে আমার মতভেদ। দিল্লীর সিংহাসনে একটিও হিন্দুকে বসতে দেওয়া হয়নি। একটিও নাম করবার মতো মন্দির তৈরি হয়নি। শত শত বছর ধরে এই চলে এসেছে।"

কয়েক সপ্তাহ পরে আর একজন অধ্যাপক বন্ধুর সঙ্গে এই নিয়ে আমার আলোচনা হয়। তিনি বলেন, "ভারতের ইতিহাসে ১৭৩৯ সাল একটি স্মরণীয় তারিখ। যেমন স্মরণীয় ১৯৪৭ সাল। সেবার আলাদা হয়ে গেল আফগানিস্তান। এবার আলাদা হয়ে যায় পাকিস্তান। দু'শো বছর আগে সকলেই

জানত আফগানিস্তানও ভারতের অঙ্গ। ভারতের এক অঙ্গের লোক যদি সারা দেশটাই অধিকার করে তা হলে কি সেটা বিদেশী কর্তৃক ভারত জয় বলে গণ্য হবে? অথচ এই ভুল ধারণাটা জাগিয়ে দিয়ে গেছে ইংরেজ ঐতিহাসিকের দল। আমাদের নিজেদের ঐতিহাসিকরাও সেই ভুল ধারণাটা জাগিয়ে রেখেছেন। পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বৈদেশিক আক্রমণ সূচনা করে না। গজনীর মাহমুদও বিদেশী আক্রমণকারী ছিলেন না। তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে হিন্দুও ছিলেন। হিন্দুরাই হিন্দুদের বিরুদ্ধে লড়েছে।”

যেটা ইন্টারপ্রোভিন্সিয়াল সেটাকে ইন্টারন্যাশনাল বলে ভুল করা হচ্ছে দেখে আমার বন্ধু আক্ষেপ করলেন। এক প্রদেশের সঙ্গে আরেক প্রদেশের যুদ্ধ, এক প্রদেশ কর্তৃক সারা দেশ অধিকার, এসব আমাদের ইতিহাসে অসংখ্যবার ঘটেছে। কেউ কোনো দিন একে গুরুত্ব দেয়নি। নতুনের মধ্যে হয়েছে এই, কাবুলের সিংহাসনে হিন্দুর জায়গায় মুসলমান বসেছে। সেও বিদেশী মুসলমান নয়। তার পর সে রাজ্য বিস্তার করতে করতে দিল্লীর সিংহাসন নিয়েছে। কাবুল প্রদেশের লোক আগে হিন্দু ছিল। ধর্মান্তর গ্রহণ করে তারা অহিন্দু হয়েছে বলে কি অভারতীয় হয়েছে বলতে হবে? না, ১৭৩৯ সালের আগে ও-কথা বলা চলে না। তা হলে দাঁড়ায় এই যে ভারতের রাজধানী ভারতের একাংশের লোক অধিকার করেছে। তাদের ধর্ম ভিন্ন বলে

দেশ ভিন্ন নয়, অন্তত তখনকার দিনে তো ছিল না। তারা যদি বৌদ্ধ হয়ে থাকত তা হলে কি তাদের দিল্লীজয়কে কেউ ভারতের স্বাধীনতাহরণ বলত ?

নাগা পাহাড়ের লোক কিছু দিন থেকে আলাদা একটা রাষ্ট্র দাবী করছে। একদিন হয়তো শুনত পাবেন তারা কমিউনিস্ট মতবাদে দীক্ষা নিয়ে নবীন বলে বলীয়ান হয়ে গোটা আসামটাই দখল করে ফেলেছে। তারপর হয়তো শুনবেন কলকাতার কমরেডরা তাদের ডেকে এনেছেন রাইটার্স বিল্‌ডিং থেকে কংগ্রেস কর্তাদের সরাতে। দমদমের যুদ্ধে তারা লেফটেনেণ্ট কর্নেল ঘোষ মৌলিককে পরাস্ত করে লালবাজার থেকে ঘোষ চৌধুরীকে হটিয়ে চৌরঙ্গীর কংগ্রেস অফিস দখল করে অতুল্য ঘোষকে মার্ক্সীয় কলমা পড়িয়ে মনুমেণ্টের চূড়ায় লাল পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে। তখন কি সমসাময়িক ঐতিহাসিকরা কেউ বলবেন, দেশ আবার পরাধীন হলো দেখছি ?

না, দেশবাসীর কাছে দেশবাসীর বশ্যতাকে কেউ পরাধীনতা বলে না। পরাধীনতা হচ্ছে এক দেশের কাছে আরেক দেশের বশ্যতা বা এক নেশনের কাছে আরেক নেশনের বশ্যতা। যেমন ইংলণ্ড বা ইংরেজের কাছে। মুসলমান আমলে কোন দেশের অধীন হয়েছিল ভারত ? কোন নেশনের অধীন ? বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ায় যারা চাকার উপরে বসেছিল আজ তারা চাকার নীচে। লাল রাশিয়ানদের

থেকে ভিন্ন গোষ্ঠীর বলে শাদা রাশিয়ান নামে তাদের পরিচয়। তাদের হাতে ক্ষমতা নেই বলে কি তারা পরাধীন? দেশ যদি স্বাধীন দেশ বলে গণ্য হয় তা হলে দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকই স্বাধীন, হলোই বা সে নিপীড়িত নিগ্রো বা উৎপীড়িত ইহুদী। হিন্দুদের হাত থেকে ক্ষমতা চলে গেল বলে ভারত হয়ে গেল পরাধীন এটা ইতিহাসের অপব্যাখ্যা। ভারত যেমন স্বাধীন ছিল তেমনি স্বাধীন রয়ে গেল পৃথ্বীরাজের পরাভবের পরেও। পলাশী পর্যন্ত। পলাশীর পরেও আইনের চোখে সে স্বাধীন থাকে দীর্ঘকাল। আইন অনুসারে পরাধীন হয় সিপাহী বিদ্রোহের পরে বাদশাকে যখন দিল্লী থেকে রেঙ্গুনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, সিংহাসনচ্যুত করা হয়। মহারানী যখন রাজ্যভার নেন। সেই দিনটির আগে আমরা কেউ কোনো দিন পরাধীন হইনি, কারণ আমাদের দেশ পরাধীন হয়নি। হবার মধ্যে হয়েছে বার বার শাসক পরিবর্তন, বিভিন্ন তাদের ধর্ম। কিন্তু কেউ তাঁরা বিদেশী ছিলেন না। এমন কি বাবরকেও বিদেশী বলা চলে না। যদি কাবুলকে ভারতের প্রদেশ বলে মনে রাখি। তিনি ভারতের বাইরে থেকে ভারত শাসন করেন নি। মহারানীর মতো। বহির্ভারতের কাছে ভারতের স্বার্থ বলি দেননি ব্রিটিশ শাসকের মতো। আর যদি বিদেশী হয়েই থাকেন তাঁরা তবে তা ক'দিনের জন্যে। এক পুরুষ যেতে না যেতে বিয়ে থা

করে এ দেশী বনে যান। ইংলণ্ডেও এ রকম কত বার হয়েছে।

ধর্ম আমাদের ইতিহাসবোধে যে জটিলতা সৃষ্টি করেছে ব্রিটিশ আমলের পরাধীনতা তাকে জটিলতর করেছে। এখন স্বাধীনতার পাঁচ বছর পরেও আমরা চিন্তার প্যাঁচ থেকে মুক্ত হতে শিখিনি। ভুল চিন্তা থেকে আসে ভুল কাজ। ভুল কাজ থেকে নানা বিপর্যয়। মাশুল দিতে হয় লক্ষ লক্ষ অভাগাকে। গত পাঁচ দশ বছরে যেসব দুর্ঘটনা ঘটেছে তার দায়িত্ব কেবল রাজনীতিকদের নয়, বুদ্ধিজীবীদেরও। ভুল করি আমরা, মাশুল দেয় ওরা।

(১৯৫২)

আমাদের ইতিহাস

আমাদের ইতিহাস নতুন করে লেখার সময় এসেছে। কেন, বলছি।

ছেলেবেলা থেকে পড়ে আসছি আমাদের ইতিহাসের তিনটি যুগ। প্রথমে প্রাচীন ও হিন্দু যুগ। মাঝখানে মোসলেম যুগ। পরিশেষে ব্রিটিশ যুগ। ছেলেবেলা থেকে এই যে সাম্প্রদায়িক ও বিজাতীয় ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়েছে এ যদি সত্য হতো তা হলে না হয় কবির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে পারা যেত, "ভালো মন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে।"

কিন্তু এ কি সত্য?

হিন্দু নামে একটি জাতি ছিল, সে জাতি আর নেই, এ রকম যদি হতো তা হলে হিন্দু যুগ নামে একটা ঐতিহাসিক যুগের তাৎপর্য থাকত। কিন্তু তা তো নয়। হিন্দু তখনো ছিল, এখনো আছে, মাঝখানে পালিয়ে যায়নি। হিন্দুর সংখ্যা তখনকার চেয়ে বরং বেড়েছে। হিন্দুর অনুপাতও কমেনি, কারণ এখন যেমন মুসলমান আছে তখন তেমনি বৌদ্ধ ছিল শতকরা বিশ পঁচিশ জন। তা হলে হিন্দু যুগ বলার অর্থ কী? বোধ হয় অর্থ এই যে, তখনকার দিনে হিন্দুর হাতে ক্ষমতা ছিল, তার পরে মুসলমানের হাতে চলে যায়। এটাও একটা অর্ধসত্য বা অপসত্য। রাজাদের হাতে ক্ষমতা

ছিল, প্রজাদের হাতে নয়। সুলতানদের হাতে ক্ষমতা গেল, ভিস্তি, দরজী, বাবুর্চি-খানসামার হাতে নয়। এই যে হাত বদল, এটা রাজাতে রাজাতে, প্রজাতে প্রজাতে নয়। "রাজারা হিন্দু ছিলেন", এর মানে কি এই যে, "হিন্দুরা রাজা ছিলেন?" কিম্বা "সুলতানরা মুসলমান ছিলেন", এর মানে কি এই যে, "মুসলমানরা সুলতান ছিলেন?" তা নয়। অথচ এ রকম একটা ন্যায়শাস্ত্রবিরুদ্ধ সংস্কার মানুষের মনে রাজত্ব করছে। এবং এর জন্যে দায়ী ইতিহাসের পুঁথি। "ক্ষমতা ছিল যাদের হাতে তারা হিন্দু, অতএব যুগটা হিন্দু", অথবা "ক্ষমতা গেল যাদের হাতে তারা মোসলেম, অতএব যুগটা মোসলেম", এ ধরণের যুক্তি তাদের মুখেই শোভা পায় যারা সাধারণ লোককে মনে করে লেজুড় আর রাজা রাজড়াকে আসল শরীর। প্রজাতন্ত্রী ভারত এই রাজতন্ত্রী মনোভাব সহ্য করবে না। যদি করে তা হলে বুঝতে হবে প্রজাতন্ত্রের ভিৎ পাকা নয়। ইতিমধ্যেই এর দ্বারা যতদূর সম্ভব অনিষ্ট হয়েছে। স্বরাজকে হিন্দুরাজ বলে ভুল করে তার পাল্টা মোসলেম রাজ দাবী করা হয়েছে, দাবী হাসিল হয়েছেও। সাধারণ মুসলমান ঠাওরেছে সাধারণ হিন্দু তার প্রজা, সাধারণ হিন্দুও ঠাওরেছে সাধারণ মুসলমান তার প্রজা। এর জন্যে কি ঐতিহাসিকেরও দায়িত্ব নেই?

তারপর মুসলমানদের জন্যে আলাদা একটা যুগ নির্দেশ করা কেন? তারা কি একটা বিদেশী জাতি, বাইরে থেকে

এসে ক্ষমতা আত্মসাৎ করেছিল? তারা কি ভারতের সবটা দখল করতে পেরেছিল? আসলে তেমন কিছু ঘটেনি। এখন যাকে আফগানিস্থান বলা হয় তখনকার দিনে তার রাজা প্রজা সকলেই ছিল হিন্দু অথবা বৌদ্ধ। ওটা ভারতেরই একটা প্রদেশ ছিল, যেমন কাশ্মীর। সাধারণের মধ্যে ইসলাম ধর্মের প্রসার হয়, ক্ষমতা চলে যায় নবধর্মে দীক্ষিত কয়েকটি সামন্ত পরিবারের হাতে। তারাই ক্রমে ক্রমে অন্যান্য প্রদেশে রাজ্য বিস্তার করে। দিল্লীর সিংহাসন চলে যায় তাদের অধিকারে। দিল্লী যার ভারত তার, এ রকম একটা সংস্কার আছে বটে। কিন্তু এর মূলে কতটুকু সত্য আছে? দিল্লীর সরকার হিন্দু যুগেও ভারত সরকার ছিল না, মুসলিম যুগেও সব সময় নয়, মাত্র কিছু দিন। কোনো দিন সারা ভারত দিল্লীর শাসন মেনে নেয়নি, যারা মেনে নিয়েছে তারাও অধিকাংশ স্থলে প্রজা হিসাবে মেনে নেয়নি, নিয়েছে করদ রাজাহিসাবে। ব্রিটিশ আমলে যেমন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এবং ইণ্ডিয়ান স্টেট্‌স বলে দুটো আলাদা আলাদা ভাগ ছিল মুসলিম আমলেও তেমনি দুই স্বতন্ত্র অংশ। এক অংশ দিল্লীতে নজর পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত। অপর অংশ দিল্লীর কর্মচারীদের দ্বারা শাসিত। মোটামুটি বলতে গেলে দক্ষিণ ভারত ছিল দিল্লীর নাগালের বাইরে, মধ্য ভারত দিল্লীকে নজর দিয়ে নিজের কর্তৃত্ব বজায় রেখেছিল, উত্তর ভারত দিল্লীর শাসন স্বীকার করেছিল। মধ্যে মধ্যে এর ব্যতিক্রম ঘটেছে।

কিন্তু ব্যতিক্রম তো অনেক সময় হিন্দুর পক্ষেও গেছে। বিজয়-নগরের পক্ষে, মহারাষ্ট্রের পক্ষে।

ব্রিটিশ যুগ কথাটা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সঞ্চার করে না, কিন্তু একটা স্বাধীন দেশের পক্ষে অপমানজনক। ব্রিটিশ যুগ আবার কী! আর পাঁচটা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মতো ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এসেছিল বাণিজ্য করতে, দিল্লীর বাদশার সনদ পেয়ে রাজ্য শাসনও করেছিল। কোম্পানীর ক্ষমতা কি ব্রিটিশ জাতির ক্ষমতা? কোম্পানীর হাত থেকে রাণীর হাতে ক্ষমতা গেলে ব্রিটিশ জাতি হয়তো ক্ষমতার আধার হয়, কিন্তু সে আর ক'টা দিন! ইতিহাসের যুগ বিভাগে এক আধ শতাব্দীকে কেউ আমল দেয় না। সুতরাং ব্রিটিশ "আমল" যদিও সত্য, ব্রিটিশ "যুগ" একটু বাড়াবাড়ি। ইংরেজ যখন ছিল তখন ইতিহাস সেইভাবে লিখতে হতো, নইলে রাজভক্তির পরিচয় দেওয়া হতো না, কিন্তু আজ তার কোন প্রয়োজনও নেই, সার্থকতাও নেই।

তা হলে ইতিহাস কী ভাবে লেখা হবে? যুগবিভাগ কি আদৌ থাকবে না? যদি থাকে তবে যুগবিভাগের নীতি ও পদ্ধতি কী রূপ হবে?

আমি ঐতিহাসিক নই, ইতিহাসের ছাত্র। আমার পক্ষে অনধিকারচর্চা হবে যদি এসব প্রশ্নের প্রামাণিক উত্তর দিতে উদ্যত হই। আমি যে উত্তর দিচ্ছি তা আমার নিবেদন মাত্র। কেউ যদি গ্রহণ করেন তবে সাম্প্রদায়িকতা ও

বিজাতীয়তার মূলোচ্ছেদ হবে, আর আধুনিকতার গোড়া শক্ত হবে।

হাঁ, যুগবিভাগ থাকবে। কিন্তু যুগবিভাগের নীতি হবে ইউরোপের মতো কালানুসারী। প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগ। প্রাচীন যুগ শেষ হয়ে যাবে গুপ্ত রাজবংশের সঙ্গে সঙ্গে ষষ্ঠ শতাব্দীতে। আবার সেই রাজবংশের কথা উঠল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এটা মার্জনীয়। কেননা অজন্তার যুগ, কালিদাসের যুগ বললে সকলে বুঝবেন না। তারপর সপ্তম শতাব্দী থেকে মধ্য যুগ আরম্ভ। মধ্য যুগের সমাপ্তি আকবরের সঙ্গে সঙ্গে ষোড়শ শতাব্দীতে। জাহাঙ্গীরের আমলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীরা আসে। তাদের সঙ্গে আসে ইউরোপীয় পণ্যদ্রব্য, ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধনতন্ত্র, গণতন্ত্র, নতুন আইনকানুন, নতুন শাসনব্যবস্থা, মুদ্রাযন্ত্র, বাষ্পীয় শক্তি। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ধীরে ধীরে সূত্রপাত হলো অধুনিক জীবনযাত্রার, আধুনিক জীবনদর্শনের। ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে এর সম্পর্ক ছিল, কিন্তু ধরুন যদি শাসনভার ইংরেজের হাতে না যেত, তা হলে কি জীবনযাত্রা নবাবী আমলের মতোই থেকে যেত? কখনো না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেশ শাসনের ভার না নিলেও তার প্রভাব পড়ত, তার মারফৎ ইউরোপের প্রভাব পড়ত, ইউরোপের মারফৎ আধুনিকতার প্রভাব পড়ত আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি শাখা-প্রশাখায়। জাপানের মতো। শাহজাহান তো ইটালী

থেকে স্থপতি আনিয়েছিলেন তাজমহলের জন্যে। আওরংজেবের রাজত্বে কলকাতা শহর পত্তন হয়। সারা সপ্তদশ শতাব্দী জুড়ে আধুনিক যুগের উপক্রমণিকা লেখা হয়। পলাশীর বহু পূর্বে।

ব্রিটিশ আমলের সঙ্গে আধুনিকতার সম্পর্ক ছিল বলে ব্রিটিশ অপসরণের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিকতাও অপসরণ করেছে তা নয়। করবেও না। ভারত আধুনিকতার সঙ্গে সংগ্রাম করেনি, ইংরেজ জাতির সঙ্গেও সংগ্রাম করেনি, করেছে ভারতের ইংরেজ সরকারের সঙ্গে। ইউরোপের সঙ্গে আধুনিকতার সঙ্গে তার একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছেও। যাঁহা পশ্চিম তাঁহা আধুনিক এ রকম একটা সংস্কার কিছুদিন আগে ছিল বটে, এখন আর নেই। ওটা ভুল সংস্কার। পশ্চিমের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য থাকতে পারে, আধুনিকতার সঙ্গে নেই। আধুনিক যুগ শেষ হয়ে যায়নি, আরো অনেককাল চলবে।

(১৯৫২)

আমাদের লক্ষ্য

এই কয়েক মাস আমাকে দিন রাত ভাবতে হয়েছে। অক্ষরে অক্ষরে দিনরাত। দেশ বিভাগ কেন হলো, কী করে হলো, নিবারণের কোনো উপায় ছিল কি না, বিকল্প কী ছিল, কতকাল এ ভাবে চলবে, ভাঙা দেশ জোড়া লাগবে কি না, জোড়া না লাগলে ক্ষতি কী, লাগলেই বা লাভ কী, এমনি কত কথা। এর জন্যে আমাকে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পেছিয়ে গিয়ে ধাপে ধাপে এগোতে হয়েছে, খতিয়ে দেখতে হয়েছে কোন পদক্ষেপে ভুল ঘটল, তার কী বিকল্প ছিল। ভাবতে হয়েছে গান্ধীর দিক থেকে। লোকে যাঁর নাম জিন্না ব'লে জানে, আসলে যাঁর নাম ঝীণা, সেই ঝীণার দিক থেকেও! দেখছি ঝীণার দিক থেকেও বলবার আছে বিস্তর। ঝীণাকে আমি এক কালে ষোলো আনা দোষ দিয়েছি, কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় সব দিক বিবেচনা করলে হিটলারকেও ষোলো আনা দোষী করা যায় না। ঝীণাকেই বা ষোলো আনা দোষের ভাগী করি কেমন করে? নিজের ও নিজের দলের রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে ও ছাড়া আর কী করণীয় ছিল তাঁর? অস্তিত্বরক্ষাই যদি মানুষের সর্বপ্রথম কর্তব্য হয়।

চিন্তা করতে করতে এইখানে এসে পৌঁছেছি যে সারা দেশকে জোড়া দেওয়ার আগের কাজ যে কারণে দেশ ভেঙে গেল সেই কারণটাকে নির্মূল করা। তা যদি না করি তবে

সেই একই কারণে দেশ ভেঙে যাবে বার বার। ইতিহাসে ঝাঁণারাও "সম্ভবামি যুগে যুগে।" দেশ যদি অবিভাজ্য হতো তাহলে এ দৃশ্য দেখতে হতো না যে, রাণাঘাট থেকে চুয়াডাঙ্গা যেতে আসতে ছাড়পত্র লাগে, visa লাগে। এই যে আমরা বাংলা দেশের হিন্দু-মুসলমান এক গালে চুণ ও আরেক গালে কালি মেখে তুনিয়ার সামনে তু'কানকাটার মতো চলছি ফিরছি, দিল্লীর কাছে করাচীর কাছে কাঁতুনি গেয়ে বেড়াচ্ছি, বিহারের সিকিখানা পেলেও এর প্রতিকার হবে না।

মূলকারণ হচ্ছে ধর্ম অনুসারে মানুষকে খোপে পোরার অভ্যাস। গত বিশ ত্রিশ বছরের খবরের কাগজ ঘাঁটলে পদে পদে নজরে পড়বে, "হিন্দু মোটর চাপা পড়ে মারা গেছে", "মুসলমান চুরি করে ধরা পড়েছে।" অন্য কোনো দেশ হলে লিখত "মানুষ" বা "লোক"। কিন্তু আমরা মানুষের দিকে তাকালে দেখতে পাই তার টিকি অথবা দাড়ি। দাঙ্গা হাঙ্গামার সময় কাপড় খুলে আরো কিছু দেখা হয়, যা সভ্য সমাজে দেখতে মানা। পাকিস্তান এক দিনে হয়নি, ছাড়পত্রও এক দিনে হচ্ছে না। এক দিনের আগে অনেক দিন গেছে, তখন কারো খেয়াল ছিল না যে এ রকম হতে পারে। একটা লোক হিন্দু কি মুসলমান তা জেনে কার কী লাভ? কেনই বা তুমি তা জানতে চাইবে, তোমার কাগজওয়ালা তোমাকে তা জানাবে কেন? ইংলণ্ডের মতো দেশে কেউ কারো ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করে না, খোঁজ নেয় না। "আপনারা কি

ক্যাথলিক না, প্রোটেস্টান্ট” এ ধরনের জিজ্ঞাসা দস্তুরমতো অসভ্যতা। পথে ঘাটে দোকানে বাজারে আপিসে আদালতে কেউ কাউকে ধর্মের পরিচয় দিতে বাধ্য করে না। খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় ব্যক্তির ধান ভানতে গিয়ে সম্প্রদায়ের শিবের গীত গাওয়া হয় না। আমাদের কিন্তু এটা দ্বিতীয় প্রকৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই বিশ্রী অভ্যাস ভুলতে হবে। মানুষের সঙ্গে মানুষের দেখা হলে কার কী ধর্ম এ প্রশ্ন মুখে আনা চলবে না। মনে আনাও উচিত নয়। আমার বাড়ীতে রোজ সকালবেলা ডিম বেচতে ও মাঝে মাঝে চাল বেচতে যারা আসে তারা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করে। আমার সে কথা জানা জরুরি নয়। তবু আমার রান্নার লোকটি সে কথা আমাকে জানাবেই। “ঐ যে বুড়ো মুসলমান ও আজ এক টাকার ডিম দিয়ে গেছে।” “ঐ মুসলমান মেয়েটি আতপ চাল নিয়ে এসেছিল।” আরে বাপু, নাম কি ওদের নেই? নাম বলো না কেন?

এই যে ভেদবুদ্ধি এটা ইংরেজের সৃষ্টি নয়। এটা এসেছে জাতিভেদ থেকে। যারা চির কাল বলে আসছে, “বাগদী বুড়ো এসেছিল” বা “তাঁতী বৌ টাকা পাবে” তারাই নামের বদলে ধর্মের পরিচয় খোঁজে। এটা আমাদের বদ্ধমূল সংস্কার। সামাজিক ক্রিয়াকর্মে কে বামুন কে বাগদী তা জানা হয়তো জরুরি, কিন্তু জীবনের প্রত্যেকটি ব্যাপারে তা জানতে ও জানাতে চাওয়া বেয়াদবি। গলায় একগাছা পৈতে ঝুলিয়ে

ওটা জাহির করতে যাওয়া বর্বরতা। জুরর মহাশয় আদালতে বসেছেন মামলা বিচার করতে, তাঁর জামার গলার বাইরে এক পৈতে। মানে, কিছুক্ষণ আগে তিনি কী একটা কাজ সেরে এসেছেন। তার পরে ভুলে গেছেন পৈতেটি শার্টের তলায় ঢাকা দিতে। বোধ হয় ইচ্ছে করেই ভুলেছেন। যাদের শার্ট নেই তাদের ক্ষমা করা যায়, কিন্তু যাদের শার্টও আছে, কোটও আছে, অথচ কোনো এক ফাঁক দিয়ে পৈতে উঁকি মারছে তাদের একটু সমঝিয়ে দেওয়া ভালো যে, শার্ট কোটে তাদের অধিকার নেই, তারা ভদ্রলোক নয়!

যে দেশের লোক জীবনের প্রত্যেকটি কাজে কে কোন জাত কার কোন ধর্ম এই নিয়ে বাছবিচার করতে অভ্যস্ত তার শিক্ষার প্রয়োজন ছিল, নইলে তার মাথায় এমন ভাবে ঘোল ঢালা হতো না উল্টো গাধায় চড়িয়ে। ইতিহাস অকারণে মার দেয় না। মার যাদের পাওনা তারা এতকাল খায়নি বলে চিরকাল এড়াবে এর কোনো নজীর নেই। আরো খাবে, খেতে খেতে শিখবে। কেউ তাদের বাঁচাতে পারবে না, বাঁচাবে তাদেরই সৎকর্ম। ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে ইতিহাসের কাছে ছাড়া পাবে না। ওটা পণ্ডশ্রম। এমন কোনো হাতসাফাই নেই যা দিয়ে দুর্বলকে সবল করা যায়। দুর্বলের দুর্বলতা এক ভাবে না এক ভাবে ফুটে বেরোবেই। দুর্বলতার গোড়া কোথায় তা কি বলে দিতে হবে? ভেদবুদ্ধিই দুর্বলতার নিদান। একে নির্মূল করতে হবে, নইলে এই আমাদের নির্মূল করবে।

আবার ঝীণার প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। নিজের ও নিজের দলের রাজনৈতিক অস্তিত্বরক্ষার জন্যে তিনি যা করেছিলেন তা ছাড়া আর কিছু করণীয় ছিল না তাঁর। থাকত, যদি তিনি অহিংসায় বিশ্বাস করতেন। তাঁর কাছে সেটা প্রত্যাশা করা যায় না। সুতরাং তাঁর দিক থেকে তিনি ঠিকই করেছিলেন বলতে হবে। কিন্তু তিনি ও তাঁর দল কি সারা দেশের সব মুসলমান ? সারা দেশের সব মুসলমানের সর্বাঙ্গীন অস্তিত্বরক্ষা কি ও ভাবে হয় ? যতই দিন যাবে ততই মুসলমান সাধারণের মনে প্রশ্ন জাগবে, ঝীণা ও তাঁর দলের রাজনৈতিক অস্তিত্বরক্ষা কি সারা দেশের সব মুসলমানের সর্বাঙ্গীন অস্তিত্বরক্ষা ? নির্বিচারে নেতার নির্দেশ মেনে নেওয়া মুসলমানদের বদ্ধমূল সংস্কার। অন্ধ নিয়মানুবর্তিতার জন্যে তারা বিখ্যাত। কিন্তু ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে নেতা যদি ভুল নির্দেশ দেন তাহলে সেই ভুলের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় কোটি কোটি অনুবর্তীকে।

মুসলমানদের ধীরে ধীরে বোধোদয় হবে যে অখণ্ড মুসলমান সমাজ দ্বিখণ্ড হয়ে গেছে দেশবিভাগের ফলে। এখানকার মুসলমানকেও সেখানে যেতে হলে পাসপোর্ট নিতে হবে, ভিসা নিতে হবে। সব মুসলমানের যখন ঠাঁই নেই সেখানে তখন চার কোটি মুসলমানকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে হবে ছয় কোটি মুসলমানের কাছ থেকে। ওরাও যে বিনা পাসপোর্টে বিনা ভিসায় আসতে পারবে তা নয়। দেশের

মাঝখানে যে পাঁচিল উঠছে সেটা মুসলমান সমাজেরও মাঝখানে উঠছে। এখানকার মুসলমান ওখানকার মুসলমানকে বিয়ে করতে গেলেও পাসপোর্ট লাগবে। ওখান থেকে মেয়ে আসবে বাপের বাড়ী, তার জন্যে ভিসা লাগবে। সারাদেশের সব মুসলমানের সর্বাঙ্গীন অস্তিত্বরক্ষার কথা কি ঝীণা ও তাঁর দলবল ভেবেছিলেন, না ভাবছেন? এখনো যাদের ভুল ভাঙেনি তাদের ভুল ভাঙবে পাঁচ দশ বছর পরে। এই ছাড়পত্র প্রথাই মোহমুদ্গর।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান সাধারণকে অভয় দেওয়াও চাই। অস্তিত্বরক্ষা মানুষমাত্রেরই কাম্য। হিন্দুপ্রধান অখণ্ড ভারতে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের অস্তিত্বরক্ষা যতদিন ব্রিটিশ বেয়োনেটের উপর নির্ভর করত ততদিন মুসলমানরা নিশ্চিন্ত ছিল। যেই দেখা গেল দেশ স্বাধীন হতে যাচ্ছে, ব্রিটিশ বেয়োনেট থাকছে না, অস্তিত্বরক্ষার জন্যে হিন্দু বেয়োনেটের খোশমেজাজের উপর নির্ভর করা নিরাপদ নয় তখনি তো পাকিস্তান একটা জীবনমরণের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল। সেখানে মুসলিম বেয়োনেটের ছত্রচ্ছায়া। মজ্জাগত অবিশ্বাস ও ভয় যেখানে বর্তমান সেখানে অমন একটা সমাধানকেই মানুষ স্থায়ী সমাধান বলে ভুল করে। অবিশ্বাস ও ভয় ভেঙে গেলে তখন ভুল ভেঙে যায়। অবিশ্বাস ও ভয় ভেঙে দেবার দায়িত্ব কার? সংখ্যাগুরু হিন্দু সমাজের। আকারে বৃহৎ ভারতের। হিন্দু শিখ বেয়োনেটের। যাদের হাড়ে

হাড়ে ভেদবুদ্ধি তাদের প্রত্যেকের। এই দায়িত্ব আমরা আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করছি কি না বুকে হাত রেখে বলার সময় আসছে। এ দায়িত্বে ফাঁকি দিলে ভাঙা দেশ আর জোড়া লাগবে না।

(১৯৫২)

অহিফেন

পথে যেতে যেতে ইরানী বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো। দেখলুম তাঁর মুখে আজ অপূর্ব আভা। দেশ থেকে চিঠি এসেছে, তাঁর পিতার মৃত্যু সাধারণ মৃত্যু নয়। তিনি শহীদ হয়েছেন। মোল্লারা তাঁকে ছোরা দিয়ে হত্যা করেছে, যেহেতু তিনি বাহাই। গত একশো বছরের মধ্যে বিশ হাজার বাহাই শহীদ হয়েছেন। শহীদের রক্ত ব্যর্থ যায়নি। বাহাইরা এখন ইরাণের সব চেয়ে বড় মাইনরিটি। এক তেহরাণ শহরেই আটত্রিশ হাজার বাহাই আছেন। তাছাড়া দুনিয়ার সব দেশেই বাহাই ধর্মের প্রসার হয়েছে। জার্মানীতে আমেরিকায় কলকাতায় বাহাই কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

বাহাইরা প্রতিহিংসায় বিশ্বাস করেন না। ক্ষমা করেন। বলেন, এ কাজ যারা করেছে তারা না বুঝে করেছে। তারা অজ্ঞ। তারা একদিন এর জন্যে লজ্জিত হবে।

"কিন্তু গবর্নমেণ্ট ? রাষ্ট্র ?" আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "তাঁরাও কি আততায়ীকে ক্ষমা করবেন ?"

"গবর্নমেণ্ট !" বন্ধু করুণ হেসে বললেন, "কিছুকাল আগে এক বাহাই ডাক্তার দীনদুঃখীদের সেবা করতে গিয়ে মোল্লার প্ররোচনায় নিহত হন। আততায়ীরা বুক ফুলিয়ে পুলিশের কাছে বলে এলো আমরাই মেরেছি। বিচারে

তারা তো খালাস হলোই বরং যে দু'জন জুরর তাদের দোষী বলে সাব্যস্ত করেছিলেন তাঁদের চাকরি গেল।"

"এই হলো ইরাণের হাল।" তিনি বললেন, "এ হাল কিন্তু রিজা শা'র আমলে ছিল না। মোল্লাদের তিনি কঠোর হস্তে দমন করেছিলেন। গত পাঁচ বছর যাবৎ প্রতিক্রিয়া চলছে।"

আমি চিন্তা করে বললুম, "এটা শুধু ইরানে নয়। আমাদের এদেশেও। এমন কি ইউরোপেও। ক্যাথলিকরা এখন নতুন করে মাথা তুলছে। লিসবন থেকে বার্লিন পর্যন্ত ক্যাথলিক ধর্মের প্রাচীর তোলা হচ্ছে। কমিউনিজমকে রুখতে হলে ক্যাথলিক ধর্মের প্রাচীর চাই। তেমনি কায়রো থেকে করাচী পর্যন্ত উঠছে ইসলামের প্রাচীর। ঢাকা থেকে জাকার্তা পর্যন্ত। আমাদের হিন্দু ধর্মধ্বজরাও প্রাচীর তুলতে আরম্ভ করে দিয়েছিলেন, এক বছর আগেও সে কাজ পরম উৎসাহের সঙ্গে চলছিল। কিন্তু কংগ্রেসের উর্ধ্বতন কর্তৃত্ব থেকে তাঁদের সরিয়ে দেওয়ার পর থেকে, বিশেষ করে গত নির্বাচনের পর থেকে, প্রাচীর তৈরী মুলতুবি আছে।"

বন্ধু এইবার প্রাণ খুলে বললেন, "অমন করে কমিউনিজমকে রুখতে যাওয়ার ফল কী হয়েছে ইরানে? ইনটেলেকচুয়ালরা এক ধার থেকে কমিউনিস্ট হয়ে গেছে। এখন আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কমিউনিস্টরাই মোল্লাদের নিপাত করবে।"

এবার আমাকে বলতে হলো, "কিন্তু কমিউনিস্টরা কি

কেবল মোল্লাদের নিপাত করবে? আপনাকে আমাকে করবে না? একটা মন্দকে দূর করতে আর একটা মন্দের সাহায্য নেওয়া উচিত নয়।"

শোকে তাঁর হৃদয় ভারাক্রান্ত। আর তর্ক নয়। যথাসাধ্য সান্ত্বনা জানিয়ে বিদায় নিলুম। পিতার গৌরবে তিনি গৌরব বোধ করছেন। নয়তো সহ্য করতে পারতেন না এ আঘাত। ঠিক এমনি অবস্থা হয়েছিল ৩০শে জানুয়ারীর পর আমাদের। আমরা যারা বাপুকে হারাই। সেটা এক দল হিন্দু মোল্লার দুষ্কৃতি, যদিও একজন মাত্র হত্যাকারী।

ভারত বলো, পাকিস্তান বলো, ইরাণ বলো, ইজিপ্ট বলো অধিকাংশ প্রাচ্য দেশেই জনগণ ধর্মান্ধ। তাদের এই ধর্মান্ধতা যাতে শোষকদের কাজে লাগে তার জন্যে শোষকশ্রেণীর লোক চিরটাকাল চেষ্টা করেছে বলেই কমিউনিস্টরা ধর্মের প্রতি বিরূপ। যদিও দোষটা ধর্মের নয়, ধর্মান্ধতার। ধর্ম শোষকদের পক্ষে নয়। ধর্মান্ধতাই তাদের পক্ষে। কিন্তু স্বয়ং ধার্মিকরাও ধর্মান্ধতাকে ধর্মের স্থান দিয়ে থাকেন। সুতরাং কমিউনিস্টরাই বা না দেবে কেন? ধর্ম নয়, ধর্মান্ধতা যে জনগণের আফিম, এ বিষয়ে আমার আর সন্দেহ নেই।

সেইজন্যে বর্তমান ইউরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে ধর্মের নাম দিয়ে দলগঠন ও রাজ্যশাসন কিছুদিন থেকে একটা ঘোর অমঙ্গল সূচনা করছে। কমিউনিজমকে এরা রুখতে পারবে, কি কমিউনিজম এদের খতম করবে তা জোর করে বলা যায়

না। কিন্তু জোর করে এইটুকু বলতে পারি, এরা যদি প্রবল হয় তবে গত চারশ' বছরের প্রোটেস্টাণ্ট সেকুলার লিবারল প্রোগ্রেসিভ ট্রাডিশন বিষম একটা ধাক্কা খাবে। অত বড় ধাক্কা মার্কস লেনিনও দেননি। স্টালিনের কথা আলাদা।

জনগণকে অহিফেনমুক্ত করতে হবে। গান্ধীজী এটা চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও বোধ হয় ভাবতে পারেন নি যে অহিফেন শব্দটার আরো একটা অর্থ আছে। এই অর্থটা আরো মারাত্মক। ধর্মান্ধতার অহিফেন গান্ধীহত্যার জন্যে দায়ী। কেবল গান্ধীহত্যার জন্যে নয়, সেই দিনই সেই সন্ধ্যাবেলাই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মিষ্টান্ন বিতরণের জন্যে দায়ী। এমন একটা পূর্ব-নির্ধারিত শয়তানি ভারতের ইতিহাসে দেখা যায় নি। কিন্তু জনগণ তখন আফিমের নেশায় বুঁদ। হিন্দু মারছে মুসলমানকে, মুসলমান মারছে হিন্দুকে, ধর্মের নামে চলছে আরো কত রকম অপরাধ। গান্ধীর জন্যে শোক করেই তাদের কর্তব্য সারা হয়ে গেল।

তার পর থেকে ভারতের অবস্থা কতকটা ইরাণের পথেই চলছিল, এই সম্প্রতি একটু মোড় ঘুরেছে। আফিম ছাড়ানোর ভারটা কমিউনিস্টদের জন্যে মুলতুবি না রেখে বা আফিম দিয়ে কমিউনিজম তাড়ানোর কথা না ভেবে আমরাই যেন অহিফেনমুক্ত হই ও জনগণকে করি।

(১৯৫২)

“শাশ্বত বঙ্গ”

জবাহরলাল তাঁর আত্মকাহিনী উৎসর্গ করেছেন এই বলে—‘কমলাকে, যে আর নেই’। কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের প্রবন্ধসংকলনে উৎসর্গপত্র নেই, কিন্তু গ্রন্থের নামটাই উৎসর্গপত্র। শাশ্বত বঙ্গকে, যে আর নেই, অথচ আছে। বঙ্কিমচন্দ্র যার বন্দনা-গান করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ যাকে ভালোবেসেছিলেন, হাজার বছর ধবে যে ইতিহাসের ও ভূগোলের দৃষ্টিতে এক ছিল, এক ছিল হিন্দু-মুসলমানের চেতনায়, সে আর নেই, অথচ আছে জনকয়েক স্বপ্নদ্রষ্টার মানসে। তাঁরা হিন্দুও নন, মুসলমানও নন, তাঁরা প্রেমিক। তাঁরা ধ্যানী। তাঁদের বিশ্বাস তাঁরা ঘোষণা করে যাবেন, যদিও নিকট ভবিষ্যতে ভাঙা দেশ জোড়া লাগবে না। জোড়া লাগবে কি সুদূর ভবিষ্যতেও? আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় ভার্জিনিয়া প্রদেশ দু'ভাগ হয়ে যায়। গৃহযুদ্ধ কবে শেষ হয়েছে, নব্বই বছর পরেও দেখি পশ্চিম-ভার্জিনিয়া স্বতন্ত্র রয়ে গেছে। আশ্চর্য হব না, যদি পশ্চিম-বঙ্গের বেলা তাই হয়।

কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছি কাজী সাহেবের ‘গৃহযুদ্ধের প্রাক্কালে’ পাঠ করে। এ প্রবন্ধ আগে আমার চোখে পড়ে নি। এর থেকে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করছি ঃ—

“মুসলমান যদি সত্যই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে থাকে যে, যে কারণেই হোক হিন্দুর সঙ্গে তার মিল কোনো দিন হয় নি

কোনো দিন হবেও না, তবে তার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াই তাদের দুই পক্ষের জন্যই ভাল। কিন্তু বিচ্ছিন্ন তাকে হতে হবে ন্যায়ানুমোদিত ও সার্থক পথে, অর্থাৎ দেশকে বিভক্ত করতে হবে এমনভাবে যাতে কোনো পক্ষেরই বেশী ক্ষতি না হয় আর দুই পক্ষেরই ভবিষ্যৎ যথাসম্ভব নিবাপদ হয়। বর্তমান যে-ব্যবচ্ছেদ মুসলমান চাচ্ছে তা যেমন অসংগত তেমনি বিপদসংকুল, তার কারণ, যে-হিন্দুকে মুসলমান বিশ্বাস করতে চাচ্ছে না তারা প্রায় সমসংখ্যক রয়ে যাচ্ছে মুসলিম রাজ্যে। এর পরিবর্তে মুসলমানদের এমন বাসভূমির দাবি করা উচিত যেখানে অমুসলমান প্রায় কেউ থাকবে না, যারা থাকবে তারা থাকবে বিদেশী হিসাবেই। সেজন্য মুসলমানদের চলে যাওয়া উচিত ভারতবর্ষের এক প্রান্তে— ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তই এজন্য প্রশস্ত মনে হয়, যাঁরা পাকিস্তানের আদি উদ্‌ভাবয়িতা তাঁরাও এই ক্ষেত্রের কথাই ভেবেছিলেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের যত মুসলমান নূতন বাসভূমির বাসিন্দা হতে চাইবে তাদের সবাইকে সে-সুযোগ দিতে হবে। মুসলমানের এমন সঙ্কল্প যদি হিন্দু ও জগৎ জানতে পারে তবে এর প্রতি তারা শ্রদ্ধান্বিত হবে মুসলমানের ঐকান্তিকতা ন্যায়বোধ ও ত্যাগস্বীকার দেখে। এর জন্য যদি মুসলমানকে প্রাণপণ যুদ্ধ করতে হয় তবে সেটিও জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে। বলা বাহুল্য কেবল এমন একটা চরম ব্যবস্থার দ্বারাই হিন্দু আর মুসলমানের দীর্ঘকালের

বিবাদের একটা সন্তোষজনক অবসান সম্ভবপর, অন্য ব্যবস্থায় বিচ্ছেদ পূর্ণাঙ্গ হবে না। তাই সামান্য কারণে বিবাদের সম্ভাবনা যথেষ্ট রয়ে যাবে।"

এর পরে তিনি তাঁর সওয়াল পোর্সিয়ার মতো আরো পরিষ্কার করেছেন শাইলকের জন্যে :—

"কিন্তু এমন চরম ব্যবস্থা কি ব্যাপকভাবে ভারতের মুসলমান কাম্য জ্ঞান করতে পারবে? মুসলিম নেতারা হিন্দু-মুসলমান-বিরোধের যে-ছবি দেশের সামনে জগতের সামনে ধরেছেন তা যদি সত্য হয় তবে মুসলমানদের পারা উচিত, কেননা অন্য কোনো প্রশস্ত পথ নেই। যদি সবাই না পারে তবে যারা পারে তারা গিয়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে স্বাধীন রাজ্য গড়ুক। কিন্তু যারা পারবে না তাদের এর পরে আর হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের কথা মুখে আনা চলবে না, কেননা, হিন্দু ও মুসলমানের অতীত যাইই হোক, বোঝা গেল, মিলেমিশে না থেকে তাদের উপায় নেই। তাই এই মিলমিশের চর্চাই সম্মিলিত ভারতে করতে হবে একান্ত আন্তরিকতার সঙ্গে। হিন্দুর মুসলিম বিদ্বেষ আর মুসলমানের হিন্দু বিদ্বেষ সেখানে শুধু নিন্দনীয় নয়, দণ্ডনীয় বিবেচিত হবে। আর নতুন সম্মিলিত ভারত গঠিত হবে সাম্যবাদের ভিত্তির উপরে : ধর্ম হবে ব্যক্তিগত ব্যাপার, ভারতবর্ষের নব-নাগরিকদের জাতিধর্মনির্বিশেষে বুঝতে হবে যে তাদের প্রাচীন ধর্মের একালের অর্থ ব্যাপক মনুষ্যত্ব-সাধন, তাই

ধার্মিক হবার জন্যে তারা ফিরে যেতে চেষ্টা করবে না কোনো অতীত ব্যবস্থার দিকে, তাদের গতি হবে নব নব জ্ঞান ও কল্যাণ আহরণের অভিমুখে—সমস্ত জগৎকে সব মানুষের জন্য স্বর্গে পরিণত করার কাজে ; অতীতের কোনো ধর্মব্যাখ্যা যদি এর পরিপন্থী হয় বুঝতে হবে তা ভুল ব্যাখ্যা।"

পাঠক লক্ষ্য করেছেন যে ওদুদ সাহেব পূর্ব-পাকিস্তান সমর্থন করেন নি। তিনি তার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। তিনি বলেছেন, "আমাদের নবনেতাদের গভীর ভাবেই ভাবা উচিত বাংলার মুসলমানের সঙ্গে পাঞ্জাবের মুসলমানের অঙ্গাঙ্গী যোগ ঘটাতে গিয়ে দুয়েরই বিকাশ ব্যাহত করার মতো মহা-অনর্থ তাঁরা ঘটাবেন কি না। এর উপর রয়েছে বাংলার বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থিতি—বাংলার অতিগুরু নদনদী-সমস্যা যার দিকে মহাপ্রাণ আবুল হুসেন বিশ বছর পূর্বে দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, বাংলার বৈজ্ঞানিকেরাও যার দিকে দেশের শাসক ও জনসাধারণ সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ত্রুটি করছেন না। এই একটি সমস্যাই হয়ত দেশের সর্বসাধারণকে দেখিয়ে দেবে হিন্দু-মুসলমান-বিরোধের মতো তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে যারা এতটা সময় ব্যয় করতে পারে তারা কত বড় কৃপার পাত্র।"

হায়, এই কৃপার পাত্ররাই তুচ্ছ ব্যাপারকে উচ্চ ব্যাপারে পরিণত করে ওদুদ সাহেবের প্রবন্ধ রচনার কয়েক মাস পরে। এ প্রবন্ধ ১৯৪৬ সালের মে মাসে লিখিত। তার পরে

কলকাতার দাঙ্গা, নোয়াখালির হাঙ্গামা, বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ, গান্ধীহত্যা। ইংরেজ বিশ বছর আগে থেকে তার পলিসি স্থির করে রেখেছিল। হিন্দু-মুসলমানে বোঝাপড়া হলেই সে ভারতের শাসনভার ছেড়ে দেবে। বোঝাপড়া হবে এমনভাবে যাতে বাঁদরের হাতে পিঠে ভাগের নিক্তি থাকে। তাই শেষ পর্যন্ত হলো। ইংরেজ শাসনভার ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু ব্যালান্স অব্ পাওয়ার নিজের হাতে রেখেছে। পাকিস্তান বলতে বোঝায় বাংলাদেশের বেশীর ভাগ। সেখানে বাঙালী বলে কেউ নেই। আছে পাকিস্তানী বলে নতুন একটা নেশন বা জাতি, ধর্মে মুসলমান। হিন্দু যারা আছে তারা সমান নাগরিক নয়, তারা জিম্মী। ভারতরাষ্ট্রে পশ্চিম-বঙ্গ নামে একটি রাজ্য আছে, সেখানকার অধিবাসীরা হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে পশ্চিমবঙ্গীয়। এখনো তারা অভ্যাস-বশত বাঙালী বলে পরিচয় দেয়, কিন্তু কিছুদিন পরে 'পশ্চিম' বিশেষণটা তাদের পরিচয়ের সঙ্গে জুড়ে যাবে। এক পুরুষ বা দু'পুরুষ বাদে পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের ঐতিহ্য পর্যন্ত আলাদা হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বাংলার ভাষা, বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার আত্মবিশ্বাস সব কিছুরই ঘটেছে রক্তাল্পতা। শাইলক এক পাউণ্ড মাংস কেটে নিতে গিয়ে বহু পরিমাণ রক্তস্রাব ঘটিয়েছে। কেবল কায়িক অর্থে নয়, মানসিক অর্থেই বেশী। পোর্সিয়ার সওয়াল কোনো কাজে লাগে নি।

তা হলে কি আমাদের কোনো আশা নেই ? আছে বৈকি। সেইজন্যেই তো এ গ্রন্থের নামকরণ "শাশ্বত বঙ্গ"। ইতিহাস-ভূগোলের বাংলাদেশ আর নেই, একজোড়া বিচ্ছিন্ন ঐতিহ্য গড়ে উঠছে ; শুধু বিচ্ছিন্ন নয়, বিরুদ্ধ। কিন্তু এহো বাহ্য। ভিতরে ভিতরে বাঙালীর সঙ্গে বাঙালীর একটা মিল আছেই, থাকবেই। সে মিল ধর্মগত নয়, মর্মগত। কাজী ইমদাদুল হক সাহেবের বিখ্যাত উপন্যাস "আবদুল্লাহ্" সমালোচনা প্রসঙ্গে ওদুদ সাহেব লিখেছেন, "তবু আবদুল্লাহ্‌র মাতা, হালিমা ও রাবেয়ার অন্তরের যে মাধুর্যটুকুর সঙ্গে তিনি আমাদের পরিচিত করিয়েছেন তা মনোরম। এই মুসলিম অন্তঃপুরিকাদের দিকে চাইলেই ভাল করে বোঝা যায়, বাংলার হিন্দু ও মুসলমান বাহ্যত যতই বিভিন্ন হোক বাস্তবিকপক্ষে তাদের বিভিন্নতা কত নগণ্য—নেই বল্লে হয়তো অত্যুক্তি হয় না।"

না, অত্যুক্তি হয় না। বাঙালীর মেয়ে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক তার স্বভাব ছাড়ে নি, ছাড়বেও না। গোলাপকে যে নামেই ডাক সে তেমনি মধুর। আমাদের মা-বোনের মুখের ভাষা কোনো দিন আরবী ফারসী হয় নি, সেই শাড়ীই পরে আসছে তারা বখ্‌তিয়ার বিন খিলিজির আমলের আগে থেকে। পাকিস্তানী ডিক্‌টেটরদের শস্ত্র ও শাস্ত্র এখানে ব্যর্থ। কোনো উপায়েই তারা আবদুল্লাহ্‌র মাতা, হালিমা ও রাবেয়াকে শরৎচন্দ্রের রমা বা বিন্দু বা

পোড়াকাঠের থেকে আলাদা করতে পারবে না। তারা বাংলাদেশের হৃদয় পায় নি, পেয়েছে শরীরের একাংশ।

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল ইসলাম প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে এই গ্রন্থে। কাজী সাহেবের কাছে এঁরা সকলেই সমান আপন। নজরুলের চেয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কম আপন নন। কিন্তু কাজী সাহেবের পরম শ্রদ্ধার পাত্র রবীন্দ্রনাথ ও পরম প্রীতির পাত্র নজরুল। তাঁর সমসাময়িকদের অধিকাংশের মনোভাব তাঁর অনুরূপ। তবে তাঁর নিজের পথ ঠিক রবীন্দ্রনাথের বা নজরুলের পথ নয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ওদুদ সাহেবের নিজস্ব একটা স্থান আছে ও থাকবে। একদা তিনি 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছিলেন। এই আন্দোলন গোঁড়া মুসলমানদের উষ্মার কারণ হয়েছিল। ষাঁড়ের সামনে লাল রুমালের মতো। তাঁর দুঃসাহসিকতার জন্যে তিনি বিপন্ন হয়েছিলেন বলে জানি। কিন্তু তাঁর ভিতরকার সত্যাগ্রহী বিপদের কাছে নত হয় নি। হজরত মোহম্মদ ও মহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টান্ত তাঁকে নিঃশঙ্ক করেছে। কিন্তু তাঁর 'বুদ্ধির মুক্তি' সাধনায় যে দু'জন তাঁর গুরু বা মুর্শিদ তাঁদের নাম গ্যয়টে ও রামমোহন। এঁদের সঙ্গে তিনি অভিন্নহৃদয়। এক হিসাবে এঁদেরই কাজ তিনি করে যাচ্ছেন। 'সম্মোহিত মুসলমান' শীর্ষক তাঁর একটি পুরাতন রচনা থেকে কিছু উদ্ধৃত করি ঃ—

"জীবনের অর্থই যেন আধুনিক মুসলমান বোঝে না। বুদ্ধি, বিচার, আত্মা, আনন্দ, এ সমস্তের গভীরতার যে আস্বাদ তা থেকে তাকে বঞ্চিত ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। জগতের পানে সে তাকায় শুধু সন্দিগ্ধ আর অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে—এর কোলে যেন সে সুপ্রতিষ্ঠিত নয়, একে যেন সে চেনে না। কেমন এক অস্বস্তিকর অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে সারা জীবন সে ভীত ত্রস্ত হয়ে চলেছে। মুসলমানের, বিশেষ করে আধুনিক মুসলমানের, এই অবস্থা লক্ষ্য করেই বলতে চাই—সে সম্মোহিত। সে শুধু পৌত্তলিক নয়; সে এখন যে অবস্থায় উপনীত তাকে পৌত্তলিকতারও চরম দশা বলা যেতে পারে—তার মানবসুলভ সমস্ত বিচারবুদ্ধি, সমস্ত মানস উৎকর্ষ আশ্চর্যভাবে স্তম্ভিত! বর্তমান তার জন্য কুয়াসাচ্ছন্ন, দিগ্‌দেশবিহীন, অতীত ভবিষ্যৎ তার নেই। সময় সময় দেখা যায় বটে সে তার অতীতকালের বীরদের, রাজাদের, ত্যাগীদের, মনীষীদের কথা বলছে। কিন্তু এ শেখানো বুলি আওড়ানোর চাইতে এক তিলও বেশী-কিছু নয়। জীবনকে সত্যভাবে উপলব্ধি করবার দুর্নিবার প্রয়াসের মুখেই যে উচ্ছ্রিত হয় যুগে যুগে মানুষের বীরত্ব, ত্যাগ, শাস্ত্রজ্ঞান, মনীষা, তার প্রাচীন ইতিহাসে এর যোগ্য প্রমাণের অভাব নেই। হজরৎ ওমর ও ইব্‌নে জুবেরের মতো বীর-কর্মীদের, সাদী-ওমর-খাইয়ামের মতো মনীষীদের, গাজ্জালি-রুমির মতো সাধকদের জীবনের অন্তস্থলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এ কথা দিনের

আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে ওঠে। কিন্তু জীবনরহস্যের সেই গহনে উঁকি দেবে, এই সম্মোহিতের কাছ থেকে তা আশা করা কত দুরাশা! এ সমস্তই যে তার কাছে শুধু নাম—পঠন-অযোগ্য অক্ষরের মতো কালের পটে কতকগুলো আঁচড়। তার জন্য একমাত্র সত্য শাস্ত্রবচন। অথবা তাও ঠিক নয়, শাস্ত্রবচনের পিছনে যে সত্য-ও শ্রেয়ঃ-অন্বেষী মানব-চিত্তের স্পন্দনের অপূর্বতা রয়েছে শাস্ত্রবচনের মাহাত্ম্য-উপলব্ধির সেই দ্বার তার জন্য যে রুদ্ধ। প্রকৃত সম্মোহিতের মতো তার জন্য একমাত্র সত্য প্রভুর হুকুম—স্থূলবুদ্ধি শাস্ত্রব্যবসায়ী প্রভুর হুকুম। সেই প্রভুর হুকুমে কখনো কখনো ভবিষ্যতের অসংলগ্ন স্বপ্ন সে দেখে—কখনো 'প্যান ইসলাম' এর স্বপ্ন, কখনো এই তের শত বৎসরের সমস্ত ইতিহাস, সমস্ত বর্তমান পরিবেষ্টন, যেন জাদুমন্ত্রে উড়িয়ে দিয়ে সেই তের শত বৎসরের আগেকার 'শরীয়ত' এর হুবহু প্রবর্তনার স্বপ্ন।"

এই রচনাটির বিশ বছর পরে স্বপ্ন হয়ে উঠল বাস্তব। পাকিস্তান-রূপে।

সম্মোহিত মুসলমানকে দেশ ও কালের সঙ্গে তাল রেখে চলতে শেখানোই ছিল 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই আন্দোলন কেবল মুসলমানকে নিয়ে ব্যাপৃত ছিল না। পাশের বাড়ীতে যে হিন্দু বাস করে তার সম্বন্ধে সজাগ ও সপ্রেম ছিল। কী করে তার সঙ্গে মিলন হবে এ বিষয়ে ভাবতে ভাবতে পঁচিশ বছর আগে ওদুদ সাহেব এই সিদ্ধান্তে

পৌঁছেছিলেন যে, "হিন্দু ও মুসলমান মানুষকে এই দুই দলে ভাগ করে দেখা অসত্য—এ সম্বন্ধে আমাদের পূর্ণভাবেই জাগ্রত হতে হবে। তা হলে সহজেই আমরা বুঝতে পারব, হিন্দু-মুসলমানের এই বিরোধের মূল শুধু এই দুই সম্প্রদায়ের শাস্ত্রের ভিতরেই প্রোথিত নয়। আমাদের এই অভিশপ্ত দেশের মানুষ বহুকাল ধরে দুঃস্বপ্নে কাটিয়েছে—এমন দুঃস্বপ্ন দেখা মানুষের ইতিহাসে খুব নতুন নয়—নিজেদের শুধু হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ভাগে ভাগ করে দেখা সেই দুঃস্বপ্নেরই জের টেনে চলা। আমরা শুধু হিন্দু ও মুসলমান নই—আমরা মানুষ। সেই মানুষের অনন্ত দুঃখ, অনন্ত সুখ, অনন্ত রূপ। সে আজ আমাদের সামনে অস্পৃশ্যঅন্ত্যজ-রূপে এসেছে, মহাপ্রেমিকরূপে এসেছে, হিন্দু-মুসলমান-খৃস্টান রূপে এসেছে। কিন্তু শুধু এই-ই তার চরম অভিব্যক্তি নয়, ইতিহাসের ধারা এইখানে এসেই থেমে যায় নি। মানুষের নব নব দুঃখ, নব নব সুখ, নব নব রূপ, কালের পর্যায়ে পর্যায়ে আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। সে সমস্তের দিকে যদি আমরা না তাকাই, শুধু হিন্দু ও মুসলমান মানুষের এই কোনো একটা যুগের রূপকে তার চরম রূপ বলে মনে করি, তবে শুধু এই পরিচয়ই দেওয়া হবে যে, আমরা অন্ধ। আর অন্ধ চিরদিনই হাৎড়ে হাৎড়ে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে চলে, অল্প সময়ের জন্যও বুক ফুলিয়ে রাজপথ দিয়ে চলবার অধিকার তার নেই।"

এ সম্বন্ধে তিনি আরো ভাবতে ভাবতে দশ বছর আগে যেখানে পৌঁছলেন তার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় 'সংস্কৃতির কথা'য়। কিছু উদ্ধৃত করি :—

"হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত জীবন ভিন্ন আর কিছু যদি এদেশে সম্ভবপর না হয় তবে হিন্দু-সংস্কৃতি মুসলমান-সংস্কৃতি আর্য-সংস্কৃতি সেমীয়-সংস্কৃতি এসব কথা হয়ে পড়ে দায়িত্বহীন, এবং এসবের প্রচলন আমাদের ভাষায় ও সাহিত্যে যত কম হয় ততই মঙ্গল—ততই চিন্তার সৌখীনতা আমাদের ঘুচবে আর আমরা সত্যাশ্রয়ী হব। সার্থক সমাজ-সত্তার দিক দিয়ে বাংলার মুসলমান অথবা হিন্দু বাংলার অথবা বিশাল ভারতবর্ষের অংশ ভিন্ন যখন আর কিছু নয় তখন তার সাংস্কৃতিক জীবনের সার্থকতা লাভের পথ এই বিশাল সত্তার সঙ্গে তার গূঢ় যোগ উপলব্ধির ভিতর দিয়েই—ঝরনার সার্থকতা যেমন নদীর পুষ্টিসাধন ক'রে—এ সত্য যত অকপট ভাবে স্বীকার করা যাবে ততই শক্তি ও শ্রী লাভের পথে আমরা অগ্রসর হব। আজকার অসার্থক সংস্কৃতি-চিন্তার স্তর থেকে সার্থক সংস্কৃতি-চিন্তার স্তরে উপনীত হতে হলে যেসব ধাপ আমাদের অতিক্রম করতে হবে তার কিছু নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে এই ভাবে : ১. দেশে অভুক্ত ও কর্মহীন কেউ থাকবে না। ২. একান্ত বীভৎস না হলে কোনো সমাজেরই ধর্মাচার অশ্রদ্ধেয় বিবেচিত হবে না, সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে হবে যে—যা প্রাচীন তা প্রাচীন বলেই বরণীয় নয়, বরণীয় তার বর্তমান

কার্যকারিতার জন্যে। ৩. হিন্দু-মুসলমানের পোষাক ও নামের ব্যবধান থাকবে না অথবা অস্বীকার করা হবে। ৪. সামাজিক আদান-প্রদান—বিবাহ-আদি সমেত—সর্বত্র সহজ হবে। ৫. আইন সমস্ত দেশের জন্যে এক হবে।”

দশ বছর আগে ওদুদ সাহেব যে প্রত্যয়ে উপনীত হয়েছিলেন তা যে কোনো একজন ভারতীয় জাতীয়তাবাদীর প্রত্যয়, যথা জবাহরলালের। একে বলা যেতে পারে সেক্যুলার মনোভাব। এই মনোভাবের প্রতিবাদ কেবল মুসলমান সমাজে নিবদ্ধ নয়, হিন্দু সমাজেও পরিব্যাপ্ত ছিল ও আছে। কাজী সাহেবের পাঁচটি প্রস্তাবের মধ্যে চারটি—শেষ চারটি কি হিন্দু জনমত নির্বিবাদে গ্রহণ করবে? ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্দেশ্য শুধু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নয়। জাতি-গঠনও বটে। সে কাজের প্রায় সবটাই বাকী। ধর্মের গায়ে আঁচটি লাগবে না, সমাজের গায়ে আঁচড়টি লাগবে না, অথচ জাতি-গঠন আপনা-আপনি হয়ে যাবে, এও এক প্রকার সম্মোহন। সম্মোহিত হিন্দুকে এ কথা সমঝানো শক্ত। সে জাতিভেদও রাখবে, জাতিগঠনও করবে, যত রকম উল্টোপাল্টা উদ্ভট ব্যাপারের গোঁজামিলকে বলবে সমন্বয় বা যত পথ তত মত। শিবরাম চক্রবর্তী একবার লিখেছিলেন, আজকের জগৎ থেকে অতীতের বীজকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করতে হবে। বিশ বছর আগে এ কথা পড়ে আমি বিরক্ত হয়েছিলুম। কিন্তু এই বিশ বছরে আমার যে শিক্ষা হয়েছে তা প্রায় শিবরামের কাছা-

কাছি যায়। যা নিছক অতীত, যার মধ্যে চিরন্তনের বীজ নেই, তাকে প্রকৃতি তার নিজের হাতে ধ্বংস করে। মানুষ যদি তাকে আঁকড়ে ধরতে চায় তবে মানুষ নিজে বিনষ্ট হয়। হিন্দু বা মুসলমানের উপর ইতিহাসের পক্ষপাতিত্বের কারণ দেখি নে। ব্রিটিশ শাসন এদেরকে একপ্রকার কৃত্রিম পরমায়ু দিয়েছিল। নইলে এত দিন এদের টিকে থাকার কথা নয়। হয় এরা বদলাবে, নয় এরা সরে যাবে। আজকের দুনিয়ায় এত লোকের খোরাক নেই যে যারা নতুন কিছু করবে না, দেবে না, তাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবেই। কাজী সাহেবের প্রথম প্রস্তাব তাদেরই জন্যে যাঁরা বাকী চারটি প্রস্তাবে রাজী। নারাজদের জন্যে প্রথম প্রস্তাবও নয়। প্রকৃতির কাছে আহার প্রত্যাশা করতে পারে কেবল সেই মানুষ যে প্রকৃতির অভিপ্রায় অনুসারে বিবর্তিত হতে প্রস্তুত। যে ধর্মের, যে সমাজের বিবর্তন নেই সে প্রবলের আশ্রয় থেকে দেড়শ' বছর যুদ্ধবিগ্রহ এড়িয়েছে, বিপ্লবের মুখে পড়ে নি। তা বলে চিরদিন এড়াবে, কোনো দিন পড়বে না, এ কি সম্ভব!

(১৯৫২)

সংস্কৃতির কথা

সংস্কৃতি শব্দটি বেশী দিনের নয়। ইংরেজী কালচার শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে এর সৃষ্টি। কালচার ও কালটিভেশন একই ধাতু হতে নিষ্পন্ন। সেইজন্যে মাটির সঙ্গে তার যোগ আছে। মাটি না হলে কালটিভেশন হয় না, সকলে এ কথা জানে। কিন্তু অনেকে এ কথা জানে না যে মাটি না হলে কালচার হয় না। সংস্কৃতি শব্দটির হাতে পায়ে মাটি লেগে না থাকায় অনেকের মনে হয়তো এ রকম একটা ধারণা জন্মেছে যে সংস্কৃতি একটা আকাশকুসুম। প্রথমেই ভেঙে দিতে হবে এই ভ্রান্তি। ফুলমাত্রেই মাটির ফুল, মাটি বিনা ফুল ফোটে না। সংস্কৃতিও এক প্রকার ফুল ফোটানো বা ফ্লাওয়ারিং। ওর জন্যে চাই দেশের মাটি, দেশের ভাষা, দেশীয় ঐতিহ্য। এমন কোনো সংস্কৃতিব নাম জানিনে যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো না কোনো দেশের সঙ্গে সংযুক্ত নয়। বিশ্লেষণ করলে দেখবেন ইসলামী সংস্কৃতি বলে যার পরিচয় আসলে তা আরব ইরানী তুর্কি সংস্কৃতি, তার অনুষঙ্গ কিছুটা গ্রীক সংস্কৃতি, কিছুটা ফালিস্তিনের ইহুদী সংস্কৃতি। ভারতে প্রচলিত ইসলামী সংস্কৃতির অঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির রং লেগেছে। সে রং এত পাকা রং যে মুছে ফেলার উপায় নেই। দেশ বাদ দিয়ে সংস্কৃতি হয় না। দেশকে স্বীকার করতেই হয়। এক দিন না এক দিন। সংস্কৃতির ফুল

ফোটানোর জন্যে বাগানের দরকার মানতেই হয়। আরব থেকে ইরান থেকে কলম আমদানি করতে পারেন, কিন্তু মাটি জল হাওয়া আমদানি করা যায় না। সেটা যদি ভারতের না হয় তবে পাকিস্তানের হোক। পাকিস্তানের মাটি পাকিস্তানের জল পাকিস্তানের হাওয়া লাগুক মনের গায়ে। নইলে ফুল ফুটবে কী করে!

তার পর মাটি যেমন আবশ্যক তেমন আবশ্যক আলো। সূর্যের আলোর কল্যাণে ক্লোরোফিল না হলে গাছের পাতা সবুজ হয় না, আর গাছের পাতার সবুজ ধানের সবুজ ঘাসের সবুজ দেশ থেকে চলে গেলে মাটি দিয়ে তার অভাব দূর হবে না। কোনো দেশ যদি শত শত বছর ধরে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকে তা হলে সে বুড়ী হয়ে যায়, তার যৌবন হারিয়ে যায়। ভারতেরও তাই হয়েছিল দীর্ঘকাল বৃহৎ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে। জরাগ্রস্ত ভারতীয় সংস্কৃতি এই একশো দেড়শো বছরে অনেকটা যৌবনমত্ত হয়েছে। কিন্তু যথেষ্ট নয়। প্রতিদিন আমরা তারুণ্যের ক্ষীণতা অনুভব করছি। পাকিস্তানেও তারুণ্যের দৈন্য এখানকার মতোই। বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে হবে, সারা জগতের জ্ঞানভাণ্ডার রসভাণ্ডার লুট করতে হবে। নইলে আমাদের মন সবুজ হবে না। পাণ্ডুর বিবর্ণ মন যে ফুল ফোটাবে তা আকাশকুসুম নয়, কিন্তু তা বলে তার মূল্য এমন কিছু নয়। ঐ মনসামঙ্গল বা সতী ময়না লিখে সংস্কৃতির গৌরব করা চলে না।

এর পরে আরো কথা আছে। আমাদের সংস্কৃতি ক্রমে সর্ব সাধারণের হবে, দু'পাঁচ জন শিক্ষিত ভদ্রলোকের নয়। তাতে লক্ষ লক্ষ নারী পুরুষ যোগ দেবে, যারা এত কাল নিরক্ষর ছিল তারাও হবে পাঠক, লেখক, সমঝদার, পৃষ্ঠ-পোষক। সামনে একটা বিরাট পরিবর্তন আসছে। তাকে বলা যেতে পারে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। গ্রামে গ্রামে গানের দল নাচের দল নাটকের দল হবে, তাদের জন্যে অসংখ্য গান রচিত হবে, নৃত্য কল্পিত হবে, নাটক সৃষ্ট হবে। আগামী দিনের সংস্কৃতি যে আজকের মতো হবে না এ কথা সহজেই বোঝা যায়। তাতে প্রচুর ভালোর সঙ্গে প্রচুর মন্দও থাকবে। রুচিবিকৃতি থাকা খুবই সম্ভবপর। সেইজন্যে জনগণের রুচিগঠনের ভার নিতে হবে এখন থেকেই। নতুবা তখন যে সংস্কৃতির উদ্‌ভব হবে তাও গর্ব করবার মতো হবে না। কোয়ান্টিটি তো সব কথা নয়, কোয়ালিটি থাকলে তবেই হয় মূল্য। যা অসার তা অস্থায়ী। তা জনগণের বলে কি মহাকাল তাকে একটা স্বতন্ত্র পরমায়ু দেবে? সে বড় কঠোর বিচারক। সে কারো মুখ চেয়ে বিচার করে না। যার রস নেই তা কি পরিমাণের জোরে টিকবে? রসই শেষ কথা ও সার কথা। সুতরাং রসের সাধনাই করে যেতে হবে যেমন এ যুগে তেমনি সে যুগেও। যেন ছেদ না পড়ে এই সাধনায়।

সাধারণভাবে বলা হলো এসব কথা। পূর্ব পাকিস্তানের

জন্যে বিশেষ করে বলতে হলে আর একটু জুড়ে দেওয়া চাই। পূর্ব পাকিস্তান কারো লেজুড় নয়। না ভারতের, না পশ্চিম পাকিস্তানের, না ইসলামের। তার নিজস্ব একটা ধারা আছে। আঞ্চলিক ধারা। সে ধারা এখনো শুকিয়ে যায়নি, কখনো শুকিয়ে যাবে না। যত দিন পদ্মা মেঘনা থাকবে, যত দিন সমুদ্র থাকবে ততদিন আঞ্চলিক ধারাও থাকবে। আঞ্চলিক সংস্কৃতিও থাকবে। হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীস্টান নির্বিশেষে সকলে মিলে তাকে বাঁচিয়ে রাখবে, বাড়িয়ে তুলবে ও জগৎসভায় ঠাঁই করে দেবে। পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যিকদের মধ্যে যেন ধর্মভেদ না জাগে। ও ছাড়া আর কোনো শত্রু নেই তাঁদের।

(১৯৫২)

সমাজের কথা

হাজার বছর আগে আমাদের দেশে রাষ্ট্র যাঁদের হাতে ছিল সমাজও ছিল তাঁদেরই হাতে। দেশীয় রাজ্যে এই অদ্বৈত ভাব এই সেদিনও দেখেছি। বড়োদা প্রভৃতি রাজ্যে তাই সমাজ সংস্কার রাজার এক কথায় হয়েছে। কিন্তু যেসব প্রদেশ প্রথমে মুসলমানের অধীন ও পরে ইংরেজের অধীন হয় তাদের ঐতিহ্য অন্যরূপ। রাষ্ট্র যাঁদের হাতে পড়ল সমাজ যাতে তাঁদের হাতে না পড়ে তার জন্যে অনেক আটঘাট বাঁধতে হলো। রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ দাঁড়াল পরের ঘরের সঙ্গে নিজের ঘরের। এই দ্বৈত ভাব আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়েছে, তাই আইনের সাহায্যে সমাজসংস্কারের প্রস্তাব উঠলে এখনো আমরা চিৎকার করে উঠি, "গেল সমাজ! গেল ধর্ম!" এটা আমাদের দ্বিতীয় স্বভাব। মনে থাকে না যে স্বাধীনতা আমরা চেয়েছিলুম এই দ্বৈত ভাবটাকে দূর করার জন্যেই।

এমন কোনো স্বাধীন দেশের নাম আমার জানা নেই যেখানে রাষ্ট্র ও সমাজ পরস্পরকে দূর থেকে পরিহার করে। আমাদের দেশীয় রাজ্যেও এই পারস্পরিক বিরূপতা এত দিন পর্যন্ত ছিল না। রাজার হুকুমে প্রজার পদবী বদলে যেতে দেখেছি। বদলাতে বদলাতে এক অজ্ঞাতকুলশীল বালক হলো নীচু দরের ব্রাহ্মণ, তার পরে ধাপে ধাপে উঁচু দরের

ব্রাহ্মণ। সমাজ এটা মেনে নিতে বাধ্য হলো। রাজার হুকুমে নতুন জাত সৃষ্টি হলো। সমাজ স্বীকার করে নিল। আমাদের দেশীয় রাজাদের দোষ অনেক ছিল। কিন্তু সমাজসংস্কারের বেলায় তাঁরা ইংরেজের মতো ভীত কুণ্ঠিত দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন না। ইংরেজের এই সংস্কারবিমুখতা স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রনায়কদেরও স্পর্শ করেছে। শ্রীযুক্ত পাট্টাভি সীতারামাইয়া বলেন হিন্দু সমাজের আইনকানুন বদলানোর অধিকার ভারতীয় পার্লামেন্টের নেই। কার্যত তাই দেখা যাচ্ছে। তা হলে আমরা দেশীয় রাজাদের জুলুম এড়াতে গিয়ে অন্তত একটি ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীলদের পাল্লায় পড়েছি। অন্য কোনো স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রনায়কদের মুখে এই ধরণের উক্তি শোনা যায় না। স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায় এখনো আমাদের নেতারাই তা বোঝেননি। এঁরা রাজা হবেন, অথচ সমাজের ভয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবেন। সংস্কারের অভাবে সমাজকে অধঃপাতে যেতে দেবেন।

আমাদের রাষ্ট্র এখন আমাদের হাতে এসেছে। আমাদের সমাজও আমাদের হাতে। আমাদের ভয়ডর কাকে? সমাজের সঙ্গে রাষ্ট্রের দ্বৈতভাব তবে কেন টিকে আছে? কার জোরে টিকে আছে? দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের অগ্রগতির বদলে পশ্চাদ্‌গতি হবে এই বা কেমন কথা? পার্লামেন্টের যদি সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ

করার অধিকার না থাকে তবে রাজার স্থান পূরণ করবে কে? বল্লালসেন কি হস্তক্ষেপ করেননি?

ভারতের মতো চীনদেশের সমাজও নানা প্রাচীন প্রথার পেষণে চলৎশক্তি হারিয়েছিল। আশা করা গেছল কুওমিনটাং সমাজকে তার চলৎশক্তি ফিরিয়ে দিয়ে রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করবে। কিন্তু দেখা গেল শক্তি বলতে কুওমিনটাং বোঝে সামরিক শক্তি। বলপরীক্ষার দিন সামরিক শক্তি তার কোনো কাজে লাগল না। ক্ষমতা চলে গেল কমিউনিস্ট পার্টির হাতে। ক্ষমতা হাতে পেয়ে কমিউনিস্টরা ফতোয়া জারি করল—বাল্যবিবাহ বন্ধ হলো, পিতামাতার নির্বন্ধে বিবাহ করা চলবে না, স্বেচ্ছাবিবাহ প্রবর্তিত হলো। বিধবাবিবাহে কেউ বাধা দিতে পারবে না। বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হলো। রক্ষিতাবৃত্তি ও গণিকাবৃত্তি উঠিয়ে দেওয়া হলো। গণিকালয় থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গণিকাদের লেখাপড়া শিখিয়ে হাতের কাজ শিখিয়ে অন্যান্য বৃত্তির উপযুক্ত করে তোলা হলো।

সমাজের অর্ধেক লোক তো নারী। অর্ধেক লোক যদি পঙ্গু হয়ে থাকে তা হলে সমাজ কী করে চলৎশক্তি ফিরে পাবে? আর সমাজ যদি পক্ষাঘাতে অসাড় হয় তা হলে রাষ্ট্র কী করে শক্তিশালী হবে? শুধু সামরিক শক্তি বাড়িয়ে? চিয়াং কাইশেক হয়তো তাই মনে করতেন, মাওৎ সে তুং তা মনে করেন না। তিনি যেমন শূদ্রশক্তির

উদ্বোধন করে জয়যুক্ত হয়েছেন তেমনি নারীশক্তির উদ্বোধন করে জয়ের ভিত্তি দৃঢ়মূল করছেন। নারী ও শূদ্রের সমবেত শক্তি তাঁকে মহাশক্তিমান করেছে। তিনি যদি প্রতিজ্ঞা করে বসে থাকতেন যে সমাজসংস্কারে হাত দেবেন না, সমাজ যেমন আছে তেমনি থাকুক, তা হলে সামরিক শক্তির অতিরিক্ত কোনো শক্তি তাঁর পিছনে থাকত না।

মহাস্থবির চীন এমনি করে পুনর্যৌবন লাভ করছে। দেখতে দেখতে সে এশিয়ার অগ্রগণ্য শক্তিধর হয়ে উঠল। আর কয়েক বছর পরে দেখা যাবে সে ভারতকে শিক্ষাদীক্ষায় ছাড়িয়ে গেছে, অন্নে বস্ত্রে অতিক্রম করেছে। এর কারণ সে সব রকম সামাজিক কুপ্রথার মূল ধরে টান মেরেছে। আর্থিক অব্যবস্থার সঙ্গে সামাজিক কুপ্রথার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। একটা না সবলে আরেকটা সরবে না। সামাজকে ঢেলে না সাজলে আর্থিক সুব্যবস্থা সুদূরপরাহত। সেইজন্যে সমাজের রূপান্তর ঘটাতে হয়। ধর্ম যদি পথ রোধ করে দাঁড়ায় তা হলে ধর্মকেও ঘা দিতে হয়। ধর্মকে যে আফিং বলা হয় তার কারণ ধর্ম নিজের এলাকার বাইরে গিয়ে সামাজিক ও আর্থিক ব্যাপারে পরিবর্তনের পথ রোধ করে দাঁড়ায়।

(১৯৫০)